সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০১৭

স্মৃতিচিহ্ন একাত্তর

উপরে: ০৮ অক্টোবর ২০১৭ ঢাকায় নদী সম্মেলনে ভারতের শ্রী রামমাধব বক্তব্য শুনছেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মো. শাহরিয়ার আলম, ভারতের আসামের মন্ত্রী শ্রী কেশব মোহন্ত ও ভারতীয় হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা ॥ ২৩ অক্টোবর হাই কমিশনারের ইংরেজি সংবাদপত্র *ডেইলি সান*-এর ৭ম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে সম্পাদক এবং তাঁর দলকে অভিনন্দন জ্ঞাপন ॥ ২৫ অক্টোবর ঢাকায় সেতু ভবনে সড়ক, পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলার সৌজন্য সাক্ষাৎ ॥ ২৬ অক্টোবর হাই কমিশনারের সঙ্গে ভারতে ব্যাংকের কার্যক্রম নিয়ে ইস্টার্ন ব্যাংক লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী আলী রেজা ইফতেখারের আলোচনা

নীচে: ২৯ অক্টোবর হাই কমিশনারের সঙ্গে ঢাকার লা মেরিডিয়ান হোটেলের জি এম গাব্রিয়েল এস কনস্টান্টিনস ও তাঁর প্রতিনিধি দলের সাক্ষাৎ ॥ ৩০ অক্টোবর হাই কমিশনারের বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের নতুন রাষ্ট্রদূত হিরোয়াসু ইজুমিকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন ॥ ৩০ অক্টোবর হাই কমিশনারের সঙ্গে ঢাকার প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলের জিএম পল ফ্লাট এবং সেলস ডিরেক্টর জনাব আউয়ালের সাক্ষাৎ ॥ ২৩ নভেম্বর হাই কমিশনারের সঙ্গে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন। মন্ত্রীর ১৬ ডিসেম্বর কলকাতায় অনুষ্ঠেয় বিজয় দিবস স্মরণোৎসবে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা দলের প্রতিনিধিত্বকারী হিসেবে আমন্ত্রণ গ্রহণ ॥ ৬ নভেম্বর সন্ধ্যায় ৬৩তম কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি কনফারেন্স-এ যোগ দিতে আসা ভারতের লোকসভার মাননীয় স্পীকার ও সংসদীয় প্রতিনিধিদলের সম্মানে আয়োজিত নৈশভোজে হাই কমিশনার ও হাই কমিশনের কর্মকর্তাবৃন্দ ॥ ১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বর স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ভারতের বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদান উপলক্ষে একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি আয়োজিত 'ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী এবং দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক নিরাপত্তা'বিষয়ক সেমিনারে হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলার বক্তব্য প্রদান। সেমিনারে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অংশগ্রহণ করেন

সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

বর্ষ ৪৫ | যুগ্ম সংখ্যা ১১-১২ | কার্তিক-পৌষ ১৪২৪ | নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০১৭

Website: **www.hcidhaka.gov.in**
/IndiaInBangladesh; @ihcdhaka; /HCIDhaka
IGCC Facebook page: /IndiraGandhiCulturalCentre

Bharat Bichitra
Facebook page: /BharatBichitra

নৃতত্ত্ব

বন্যেরা বনে সুন্দর শিশুরা মাতৃক্রোড়ে...

পৃষ্ঠা: ১৬

সূ চি প ত্র

কর্মযোগ	আইভিএসি, মিরপুর রোডে এ্যাপয়েন্টমেন্ট লাগবে না ০৪
	বাংলাদেশের বিচারিক কর্মকর্তাদের ভারতে প্রশিক্ষণ ০৫
	হাই কমিশনারের জয়পুর ফুট ক্যাম্প পরিদর্শন ০৬
	রাষ্ট্রীয় একতা দিবসে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ ০৭
	বাংলাদেশ-ভারতের প্রধানমন্ত্রীদের রেল প্রকল্প উদ্বোধন ০৮
	ভারতে শিক্ষাগ্রহণকারীদের অ্যালামনাই এসোসিয়েশন 'মৈত্রী'র উদ্বোধন ০৯
মুক্তিযুদ্ধ	স্মৃতিচিহ্ন একাত্তর ॥ শেখর দত্ত ১০
নৃতত্ত্ব	বন্যেরা বনে সুন্দর শিশুরা মাতৃক্রোড়ে ॥ দীপিকা ঘোষ ১৬
ছোটগল্প	অদৃশ্য মানুষ ॥ শ্যামল দত্তচৌধুরী ২১
	অমীমাংসিত ॥ খোরশেদ বাহার ৩১
কবিতা	এস এম তিতুমীর ॥ নিজাম উদ্দিন আহমেদ
	দ্বিজেন্দ্রলাল আচার্য ॥ দুখু বাঙাল ২৪
	শিরিন সুলতানার ২টি কবিতা ২৫
সংগীত সংবিৎ	অমৃতের কান্না গীতা দত্ত ॥ ফিরোজ মাহমুদ খান ২৬
যোগ	দিল্লিতে তৃতীয় বিশ্ব যোগ সম্মেলনে ॥ মুহাম্মদ হারুন ২৮
উচ্চশিক্ষা	বাংলাদেশী শিক্ষার্থীদের জন্য ভারত সরকারের স্কলারশিপসমূহ ৩০
শিশুতীর্থ	ভূতের ভূত-ভবিষ্যৎ ॥ তৌহিদ-উল ইসলাম ৩৬
ধারাবাহিক	তর্পণ ॥ ঋতা বসু ৩৭
রাজ্য পরিচিতি	মধ্যপ্রদেশ ৪০
শেষ পাতা	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ॥ এমিলি জামান ৪৮

পৃষ্ঠা ১০

স্মৃতিচিহ্ন একাত্তর

'তোমাদের দেশের সাথে আমাদের দেশ পাঞ্জাবের যেমন মিল রয়েছে, অমিলও কিন্তু কম নয়।' বীরদীপ্ত গর্বিত মুখমণ্ডলে এখন কালো ছায়া। দীর্ঘনিঃশ্বাস দীর্ঘতর হল। ব্রহ্মপুত্রের দিকে তার স্থির দৃষ্টি। মুখে কোন কথা নেই। কল্পনায় যেন কিছু দেখছে মেজর অর্জুন সিং। 'আমি তোমাদের দেশে যাইনি। তবে দেশ কি একটাই ছিল না?' ঈষৎ হেসে, একটু থেমে নির্বাক আনমনা বন্ধুটিকে কথার মধ্যে টেনে আনতে চাইল আনোয়ার। একদিকে গতদিনের যুদ্ধ বিজয়ের অভূতপূর্ব শিহরন-আনন্দ, ওপরদিকে আগামী দিনের যুদ্ধের শঙ্কা-উদ্বেগ। সমান তালে চলছিল দু'বন্ধুর মুখ। অর্জুনের হঠাৎ নীরবতায় আনোয়ার বেশ অস্বস্তিতে পড়ল।... ...

সম্পাদক নান্টু রায়
ফোন ৫৫০৬৭৩০১-৮, ৫৫০৬৭৬৪৫-৯ এক্স: ১২৩৯
e-mail: editor.bb@hcidhaka.gov.in

শিল্প নির্দেশক ধ্রুব এষ
প্রচ্ছদ ও গ্রাফিক্স মো. জিলানী চৌধুরী

মুদ্রণ ডট নেট লিমিটেড
৫১-৫১/এ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০। ফোন ০২ ৯৫৬৩৫৭৮

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ভারতীয় হাই কমিশন
প্লট ১-৩, পার্ক রোড, বারিধারা, ঢাকা-১২১২

ভারতীয় জনগণের শুভেচ্ছাসহ বিনামূল্যে বিতরিত ভারত বিচিত্রায় প্রকাশিত সব রচনার মতামত লেখকের নিজস্ব– এর সঙ্গে ভারত সরকারের কোন যোগ নেই।
এই পত্রিকার কোনও অংশের পুনর্মুদ্রণের ক্ষেত্রে ঋণস্বীকার বাঞ্ছনীয়

পাঠকের পাতা

জ্ঞান অন্বেষণে ব্যাঘাত

আপনাদের প্রচারিত *ভারত বিচিত্রা* ম্যাগাজিনটি সত্যিই খুব মনোমুগ্ধকর। ভারতবর্ষের ইতিহাস ও হাজারো সংস্কৃতি জানার উত্তম মাধ্যম হল *ভারত বিচিত্রা*। আমি এই ম্যাগাজিনটি পড়ি কিন্তু দুঃখের বিষয় হল, সব মাসে এই ম্যাগাজিনটি পিরোজপুর সরকারি গণ গ্রন্থাগারে আসে না; এতে করে জ্ঞান অন্বেষণে ব্যাঘাত ঘটছে। অতএব প্রতিমাসে সরকারি ডাকের মাধ্যমে পিরোজপুর গণ গ্রন্থাগারে অথবা আমার ঠিকানায় এক কপি করে *ভারত বিচিত্রা* পাঠালে কৃতার্থ হব।

অমৃতলাল রায়
প্রযত্নে– নির্মল মজুমদার, আদর্শ হাই স্কুল রোড
ডাকঘর: পিরোজপুর-৮৫০০, পিরোজপুর সদর
পিরোজপুর

সহায়তার আহ্বান

আমি মো. আনোয়ার-উল-ইসলাম মুকুল, বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের স্থায়ী বাসিন্দা হিসেবে নর্থ ক্যারোলিনায় বসবাস করছি। আমি একজন সমাজকর্মী এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নেতা। আমি বাংলাদেশের নওগাঁ জেলার আদি বাসিন্দা।

আমি আপনাদের কাছে বাংলাদেশের একটি শিশুশিক্ষা কেন্দ্রে সহায়তার আহ্বান জানাচ্ছি। আপনাদের সাহায্য-সহযোগিতা পেলে আমরা এই অনুন্নত ও প্রত্যন্ত গ্রামের শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে দ্রুত আধুনিক শিক্ষা প্রসারে সক্ষম হব বলে মনে করি।

আমাদের প্রকল্পটি বাংলাদেশের ১০০ কিলোমিটার উত্তরে নওগাঁ জেলার মিরাট গ্রামে অবস্থিত যা মিরাট শিশু শিক্ষা কেন্দ্র নামে পরিচিত। অত্যন্ত খারাপ যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য মিরাট গ্রামটি বিগত চার দশকের বেশি সময় ধরে অবহেলিত হয়ে আছে। গ্রামের সবার প্রচেষ্টায় শিশু কেন্দ্রটি ছোট ছোট দরিদ্র এবং অনাথ শিশুদের নিয়ে ২০০৯ সালে যাত্রা শুরু করে। এখন এই কেন্দ্রে প্রায় ১০০ দরিদ্র এবং অনাথ শিশু বিনামূল্যে শিক্ষা গ্রহণ করছে।

আমাদের প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল দরিদ্র ও অনাথ শিশুদের আধুনিক শিক্ষা দেওয়া ও তাদের মানসিক বিকাশ ঘটানো।

মিরাট শিশু কেন্দ্রটিতে আমরা শিশুদের ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি ইংরেজি ভাষা, বিজ্ঞান, অংক সমাজপাঠ ও তথ্যপ্রযুক্তির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য কম্পিউটার কারিগরি শিক্ষারও ব্যবস্থা করেছি। বর্তমানে এই স্কুলের একটিমাত্র কক্ষ রয়েছে যেখানে গ্রামের প্রায় ১০০জন দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রী মাটিতে বসে লেখাপড়া করছে। আমি আপনাদের কাছে এই অনুন্নত ও প্রত্যন্ত গ্রামের শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য যে কোন অনুদান ছাড়াও স্কুলঘর বাড়ানোর জন্য যে কোন ম্যাটেরিয়ালের জন্য সাহায্য কামনা করছি। আপনাদের সামান্য অনুদান ও সহযোগিতা বাংলাদেশে দরিদ্র ও অনাথ শিশুদের ভার্চুয়াল শিক্ষা প্রসারে নতুন দিগন্তের উন্মোচন করবে।

মো. আনোয়ার-উল-ইসলাম মুকুল
রালি নর্থ ক্যারোলিনা, যুক্তরাষ্ট্র

জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করে

শুভেচ্ছা নেবেন। আমি একটি কলেজের সাধারণ ইতিহাস বিষয়ের প্রভাষক। স্থানীয় সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের মাধ্যমে আমার কয়েকটি *ভারত বিচিত্রা* পড়ার সুযোগ হয়েছে। শিক্ষক হিসেবে *ভারত বিচিত্রা* আমার জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করে। বিশেষ করে রাজ্য পরিচিতি ও ভ্রমণকাব্য *ভারত বিচিত্রার* আকর্ষণীয় অংশ। তাই নিয়মিত *ভারত বিচিত্রা* আমার নামে পাঠানোর ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ রইল।

মো. আবদুল বাতেন
প্রভাষক, জয়নাল আবেদীন ডিগ্রি কলেজ
ডাক ও উপজেলা: তাহিরপুর, জেলা: সুনামগঞ্জ

ঘটনাপঞ্জি ❖ ডিসেম্বর

সাহিত্যিক শংকর

- ০৩ ডিসেম্বর ১৮৮২ ❖ শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর জন্ম
- ০৩ ডিসেম্বর ১৮৮৯ ❖ বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসুর জন্ম
- ০৭ ডিসেম্বর ১৮৭৯ ❖ বিপ্লবী বাঘা যতীনের জন্ম
- ০৭ ডিসেম্বর ১৯৩৩ ❖ সাহিত্যিক শংকরের জন্ম
- ০৮ ডিসেম্বর ১৯০০ ❖ উদয়শংকরের জন্ম
- ০৮ ডিসেম্বর ১৯৩৫ ❖ অভিনেতা ধর্মেন্দ্র (ধরম সিং দেওল)-র জন্ম
- ০৯ ডিসেম্বর ১৮৮০ ❖ বেগম রোকেয়া শাখাওয়াত হোসেনের জন্ম
- ১১ ডিসেম্বর ১৯২৪ ❖ সাহিত্যিক সমরেশ বসুর জন্ম
- ১১ ডিসেম্বর ১৯৩৫ ❖ সাবেক রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জির জন্ম
- ১২ ডিসেম্বর ১৮৮৭ ❖ অংকবিদ শ্রীনিবাস রামানুজনের জন্ম
- ১২ ডিসেম্বর ১৯০৫ ❖ সাহিত্যিক মূলক্‌রাজ আনন্দের জন্ম
- ১২ ডিসেম্বর ১৯৫০ ❖ তামিল অভিনেতা রজনীকান্তের জন্ম
- ১৩ ডিসেম্বর ১৯০৩ ❖ সাহিত্যিক শিবরাম চক্রবর্তীর জন্ম
- ১৪ ডিসেম্বর ১৯২৪ ❖ অভিনেতা রাজ কাপুরের জন্ম
- ২২ ডিসেম্বর ১৮৫৩ ❖ শ্রী সারদা দেবীর জন্ম
- ২৪ ডিসেম্বর ১৯২৪ ❖ প্লেব্যাক গায়ক মহম্মদ রফির জন্ম
- ২৫ ডিসেম্বর ১৮৬১ ❖ স্বাধীনতা সংগ্রামী পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যর জন্ম
- ২৮ ডিসেম্বর ১৯২২ ❖ সাহিত্যিক রমাপদ চৌধুরীর জন্ম
- ৩০ ডিসেম্বর ১৮৬৫ ❖ রুডইয়ার্ড কিপলিং-এর জন্ম

আত্মজা ও তাদের মায়ের কলকাকলিতে ঘুম ভেঙে গেলে বাইরে তাকিয়ে দেখি তখনও সুষুপ্তির ঘোর কাটেনি প্রকৃতির – শান্ত, স্তব্ধ, ধ্যানমগ্ন চরাচর কুয়াশার চাদরে মোড়া। কিছুক্ষণ পরেই পূর্ব দিগন্তে দেখা মিলল জবাকুসুম শঙ্কাশং সূর্যের– অন্ধকারের দুয়ার ভেঙে সেই জ্যোর্তিময়ের আবির্ভাবে ধীরে ধীরে সবকিছু পরিষ্কার হয়ে উঠতে লাগল। ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে উঠতে লাগল চেতনা। মনে পড়ল, এমনি শীতের দিনে ১৯৭১ সালের মধ্যডিসেম্বরে বাংলাদেশেও নতুন সূর্যোদয় হয়েছিল, নয় মাসের রক্তক্ষয়ী লড়াই-সংগ্রামের পর সেদিন লাল-সবুজের পতাকা উড়েছিল বাংলার আকাশে। সেদিন ভারতীয় মিত্রবাহিনি বাংলার মুক্তিসেনাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াইয়ে অংশ নিয়েছিলেন এবং হানাদার পাকবাহিনিকে পরাস্ত ও আত্মসমর্পণে বাধ্য করেছিলেন। ১৬ই ডিসেম্বর রমনার রেসকোর্স ময়দানে সেই আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করেন পাকিস্তানের লে. জেনারেল নিয়াজি।

ডিসেম্বরের যুদ্ধশেষের একখণ্ড চিত্রনাট্য তুলে ধরছি আজকের তরুণ প্রজন্মের জন্য যাঁরা শুধু মুক্তিযুদ্ধের গল্পই এতকাল শুনেছেন:

> রাতের অন্ধকারে পালিয়ে গেছে পাকিস্তানিরা। ভোরের সূর্য উঠতে না উঠতে কুয়াশার পর্দা ঠেলে ওরা ছুটে এসেছে পরিত্যাক্ত আর্মি ক্যাম্পে। চারদিকে মুহুর্মুহু জয়বাংলা স্লোগান। একটা হলঘর বন্দীদের। তারাই দেখিয়ে দেয় সায়েন্স বিল্ডিঙের ওপাশেই নারী নির্যাতন কেন্দ্র। সেখানকার বন্ধ দরজা ভাঙা হয়। তবু কেউ বেরোয় না। ঘরের মধ্যে অন্ধকার দাঁড়িয়ে আছে দেয়াল তুলে। বাইরে থেকে মিত্রবাহিনির অফিসার হেঁকে ওঠেন– 'কোঈ হ্যায়? ইধার আও।' কেউ সাড়া দেয় না। মুক্তিযোদ্ধারা বাংলা ভাষায় আহ্বান জানায়– 'মা-বোনেরা কেউ ভেতরে থাকলে বাইরে চলে এস। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। আর ভয় নেই। জয়বাংলা।'
>
> এই আহ্বানে একটি বিবস্ত্র মেয়ে দৌড়ে বেরিয়ে আসে ঘর থেকে। সহসা দিনের আলোয় নিজেকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ বিবস্ত্র দেখে সে ফিরে যেতে উদ্যত হয়। কিন্তু মিত্রবাহিনির অফিসার যোগীন্দর সিং নিজের শরীর দিয়ে তাকে আড়াল করে এবং ক্ষিপ্রহাতে নিজের মাথার পাগড়ি খুলে তার শরীর ঢেকে দেয়। শিখ সৈনিকটির বুকে মুখ ঢেকে মেয়েটি হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে। বিদেশী সৈনিকটি তার মাথায় হাত রেখে সান্ত্বনা দেয়, 'রোনা মাৎ মাঈ'।

সেদিনের সেই ভারতীয় অফিসারের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। সেদিন তিনি আমাদের গোটা জাতির গায়ে আব্রু তুলে দিয়েছিলেন। হুমায়ূন আহমেদ তাঁর *জোছনা ও জননী* উপন্যাসে লিখেছেন, 'ভারতীয় বাহিনীর কার্যক্রম ছোট করে দেখানোর একটি প্রবণতাও আমাদের আছে। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পর কেউ যদি বাংলাদেশে প্রকাশিত মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস ও ছোটগল্প পড়ে যুদ্ধ সম্পর্কে ধারণা করতে চায়, তাহলে তারা ভারতীয় সেনাবাহিনীর বিষয়ে কিছুই জানবে না। আমাদের গল্প-উপন্যাসে বিদেশী সৈন্যবাহিনীর বিষয় সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। লেখকরা হয়তো ভেবেছেন এতে আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের গৌরবের হানি হবে। ঋণ স্বীকারে অগৌরবের কিছু নেই। মহান জাতি এবং মহান মানুষরাই ঋণ স্বীকার করেন। আমি আমার বইটিতে আমাদের দেশের স্বাধীনতার জন্যে যে-সব ভারতীয় সৈন্য প্রাণ দিয়েছেন তাঁদের একটি তালিকা দিতে চেয়েছিলাম, যাতে পাঠকরা এই দীর্ঘ তালিকা পড়ে একবার শুধু বলেন, আহারে!'

আজকের কুয়াশাভেজা সকাল যেন সেই সকালের অভিজ্ঞান হয়ে দেখা দিল। দিন পেরোলেই নতুন বছর। স্বাগত ইংরেজি নতুন বছর ২০১৮। সবাইকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

আইভিএসি মিরপুর রোডে এ্যাপয়েন্টমেন্ট লাগবে না

১০ অক্টোবর ২০১৭-এর পর থেকে ভ্রমণ ভিসা আবেদনকারীরা কোন আগাম এ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়াই মিরপুর রোডে অবস্থিত আইভিএসি-তে সরাসরি তাদের ভিসা আবেদন জমা দিতে পারছেন। সকাল ৮-৩০ থেকে দুপুর ১২-৩০ পর্যন্ত আবেদনপত্র জমা নেওয়া হবে। ভ্রমণ ভিসা আবেদনকারীদের ভারতে ভ্রমণের নিশ্চিত টিকেট জমা দেওয়ারও আর প্রয়োজন হবে না।

ভ্রমণ ছাড়া সরাসরি স্কিমের অন্যান্য ভিসা ক্যাটাগরি যেমন মেডিকেল ভিসা, ব্যবসায়, সম্মেলন ও অন্যান্য ভিসা আবেদন আগের মতই সরাসরি জমা দেওয়া যাবে। এছাড়া প্রবীণ নাগরিক ও মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সরাসরি অন্য কাউন্টারে ভ্রমণ ভিসা আবেদনপত্র জমাদান বলবৎ থাকবে।

এই নতুন ব্যবস্থা পাইলট উদ্যোগ হিসেবে ৯ জুলাই ২০১৭ চট্টগ্রামে এবং ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৭ রাজশাহী ও রংপুরের আইভিএসিগুলোতে পরীক্ষামূলকভাবে চালু হয় এবং অনুরূপভাবে মিরপুর রোডের আইভিএসি-তে সম্প্রসারিত হল।

ভারতীয় ভিসা প্রাপ্তি সহজতর করা এবং ভারত ও বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে সংযোগ বৃদ্ধি এ পদক্ষেপের লক্ষ্য। এবছরের ডিসেম্বর নাগাদ ১৪ লাখ ভিসা প্রদানের লক্ষ্য স্থির হয়।

সীমান্তে স্থল শুল্ক বন্দরগুলোতে বিদ্যমান অবকাঠামো পর্যালোচনা

১০ অক্টোবর ২০১৭ স্থল শুল্ক বন্দর/সমন্বিত চেক পোস্টের অবকাঠামোবিষয়ক পুনর্গঠিত ভারত-বাংলাদেশ উপ-গ্রুপের প্রথম বৈঠক ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে অবস্থিত স্থল শুল্ক বন্দরগুলোতে বিদ্যমান অবকাঠামো পর্যালোচনা এবং সমন্বয় করতে দুই দেশের কর্মকর্তারা বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠকের পর তারা ঘোজাডাঙ্গা (ভারত)-ভোমরা (বাংলাদেশ) এবং পেট্রাপোল(ভারত)-বেনাপোল (বাংলাদেশ)-এ অবস্থিত স্থল শুল্ক বন্দরগুলোতে/সমন্বিত চেক পোস্ট পরিদর্শন করেন।

রাধিকাপুর চেকপোস্ট দিয়ে প্রবেশ/প্রস্থান করা যাবে না

সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো হয়েছে যে, অনিবার্য কারণবশত রাধিকাপুর স্থল সমন্বিত চেকপোস্ট দিয়ে যাতায়াত সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়েছে। পরবর্তী পদক্ষেপ না নেয়া পর্যন্ত রাধিকাপুর স্থল সমন্বিত চেকপোস্ট দিয়ে প্রবেশ/প্রস্থান করা যাবে না।

● বিজ্ঞপ্তি

০৮ অক্টোবর ২০১৭ বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কবিষয়ক নদীসম্মেলনে বাংলাদেশে আসা শ্রী রাম মাধবকে হাইকমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলার অভ্যর্থনা জ্ঞাপন

বাংলাদেশের বিচারিক কর্মকর্তাদের ভারতে প্রশিক্ষণ

৯ অক্টোবর ২০১৭ 'বাংলাদেশের বিচারিক কর্মকর্তাদের জন্য ভারতে প্রশিক্ষণ এবং সামর্থ্য তৈরি কর্মসূচি'তে অংশগ্রহণের জন্য সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সিনিয়র সহকারী বিচারক এবং মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটসহ ৪০ জনের বাংলাদেশের বিচারিক কর্মকর্তাদের প্রথম ব্যাচ ভারতের ভুপালের উদ্দেশ্যে দেশ ত্যাগ করে। বিদেশমন্ত্রকের পরিকল্পনায় 'ভারতীয় প্রযুক্তি ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা (আইটিইসি)'-র আওতায় বাংলাদেশের বিচারিক কর্মকর্তাদের জন্য এ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালিত হয়।

১০ থেকে ২৪ অক্টোবর– পনেরদিনের এই আবাসিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ভোপালের জাতীয় জুডিশিয়াল একাডেমি এবং পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও চণ্ডিগড় রাজ্যের জুডিশিয়াল একাডেমিতে অনুষ্ঠিত হয়।

বিচারিক দক্ষতা, আদালত ব্যবস্থাপনা, মামলা পরিচালন, ক্ষুদ্র আইন জুরিসপ্রুডেন্স সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ মডিউল এবং সিভিল আইন, ফৌজদারি আইন, মানবাধিকার আইন, নারী ও শিশু অধিকার আইন, পরিবেশ আইন, সম্পত্তি আইন, চুক্তি আইনসহ আইনের বিভিন্ন দিক এ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মধ্যে ছিল। প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে ই-জুডিসিয়ারির নতুন নতুন ক্ষেত্র এবং বিচারিক প্রশাসনে আইসিটি-র ব্যবহারও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

এবছরের এপ্রিল মাসে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রাষ্ট্রীয় ভারত সফরের সময় 'বাংলাদেশের বিচারিক কর্মকর্তাদের জন্য ভারতে প্রশিক্ষণ এবং সামর্থ্য তৈরি কর্মসূচি' বিষয়ক যে দ্বিপাক্ষিক সমঝোতা স্মারক গৃহীত হয়, তার আওতায় ভারত তার জাতীয় জুডিশিয়াল একাডেমি এবং বিভিন্ন রাজ্যে অবস্থিত জুডিশিয়াল একাডেমিতে ১৫০০ বাংলাদেশী বিচারিক কর্মকর্তাদের সামর্থ্য তৈরির প্রশিক্ষণ প্রদান করে। উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক এবং অভ্যন্তরীণ বিমান ভাড়াসহ প্রশিক্ষণের যাবতীয় খরচ ভারত সরকার বহন করে।

● নিজস্ব প্রতিবেদন

৯ অক্টোবর ২০১৭ সাবেক হাই কমিশনার ও রাষ্ট্রদূত, নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ এবং নতুন দিল্লির ওআরএফ এবং ঢাকার বিইআই গবেষকবৃন্দ এবং জ্যেষ্ঠ নেতা ও সাংবাদিক এবং নদী-২ সম্মেলনে যোগদানকারী ভারতের আসাম ও উত্তর-পূর্বাঞ্চল থেকে আসা অতিথিবৃন্দের সম্মানে আয়োজিত নৈশভোজে হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলার সঙ্গে বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ

হাই কমিশনারের জয়পুর ফুট ক্যাম্প পরিদর্শন

১৬ অক্টোবর ২০১৭ হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা বাংলাদেশে ভগবান মহাবীর বিকলাঙ্গ সহায়তা সমিতি আয়োজিত 'জয়পুর ফুট ক্যাম্প' পরিদর্শন করেন।

ঢাকার জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটো)-এ ভারতের ভগবান মহাবীর বিকলাঙ্গ সহায়তা সমিতি ('জয়পুর ফুট' নামে সমধিক পরিচিত) আয়োজিত বিশেষ শিবিরে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা ৬৭৫জন মানুষের মধ্যে কৃত্রিম অঙ্গপ্রতঙ্গ বিতরণ করা হয়। বিএমভিএসএস-এর ১৫জন বিশেষজ্ঞের একটি দল বাংলাদেশের মঈন ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় ২১ সেপ্টেম্বর থেকে ১৭ অক্টোবর পর্যন্ত এক মাসব্যাপী এ ক্যাম্প পরিচালনা করে।

হাই কমিশনার তাঁর বক্তৃতায় বিশ্বের অন্যান্য স্থানে ও বাংলাদেশের অঙ্গহীন মানুষদের নতুন জীবনদানে বিএমভিএসএস-এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা তুলে ধরেন।

বাংলাদেশে বিএমভিএসএস আয়োজিত এটি তৃতীয় অঙ্গ-সংযোজন শিবির। এর পূর্বে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত প্রথম দুটি শিবির থেকে ১৬১৭জন অঙ্গহীন মানুষ উপকৃত হয়েছিলেন। বিএমভিএসএস-এর তাৎপর্য এই যে, এটি দরিদ্র ও শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধীদের গুরুত্ব দেয় এবং কোন বৈষম্য ছাড়াই সম্পূর্ণ বিনামূল্যে অঙ্গপ্রতঙ্গ, ক্যালিপার (সংযোজনকারী ধাতব পাত) এবং অন্যান্য সাহায্য প্রদান করে। আজ পর্যন্ত সারা বিশ্বে এবং ভারতে ১৬ লক্ষ মানুষ এই মানবিক কার্যক্রম থেকে সেবা লাভ করেছেন। বাংলাদেশ ছাড়াও, বিএমভিএসএস আফগানিস্তান, ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র, হন্ডুরাস, নেপাল, পাকিস্তান, সোমালিয়া, সুদান, শ্রীলঙ্কা এবং অন্যান্য দেশে ক্যাম্প পরিচালনা করেছে। ২০১০ সালে সংঘর্ষ-পরবর্তী উত্তর শ্রীলংকার ভাবুনিয়ায় (১০৮৭টি অঙ্গ) এবং ২০১১ সালে জাফনায় (৫৩৫টি অঙ্গ) যে ফুট ক্যাম্পগুলির আয়োজন করা হয়েছিল, তার মধ্যে জয়পুর ফুট ক্যাম্পের অংশগ্রহণ ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

জয়পুরের ভগবান মহাবীর বিকলাঙ্গ সহায়তা সমিতি (বিএমভিএসএস) একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান যা শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী, বিশেষত আর্থিকভাবে দুর্বল এবং সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের মধ্যে কৃত্রিম অঙ্গ, ক্যালিপার এবং অন্যান্য পুনর্বাসন সহায়তা বিনামূল্যে প্রদান করে থাকে। ১৯৭৫ সালে শ্রী ডি আর মেহতা প্রতিষ্ঠিত এ প্রতিষ্ঠানটি প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশ্বের বৃহত্তম সংস্থা। ভারতে বিএমভিএসএস-এর ২৩টি শাখা আছে এবং ভারত ও ভারতের বাইরে এই শাখাগুলি শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী ও আর্থিকভাবে দুর্বল রোগীদের এইসব কেন্দ্রগুলিতে ভ্রমণের জন্য মাঠ পর্যায়ের অস্থায়ী ক্যাম্পের আয়োজন করে। বিএমভিএসএস এ পর্যন্ত এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকাসহ বিশ্বের ২৯টি দেশে ৫০টির বেশি ক্যাম্প পরিচালনা করেছে।

ঢাকায় হাই কমিশনের উদ্যোগে আয়ুর্বেদ দিবস উদ্‌যাপন

১৭ অক্টোবর ২০১৭ ভারতীয় হাই কমিশন ধন্বন্তরি জয়ন্তী উপলক্ষে ঢাকায় 'আয়ুর্বেদ দিবস' উদ্‌যাপন করে। এ উপলক্ষে হাই কমিশন বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য অধিদপ্তর (ডিজিএইচএস)-এর সহযোগিতায় সকালে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাখালীস্থ এমআইএস অডিটোরিয়ামে 'আয়ুর্বেদের প্রসার' শীর্ষক এক সেমিনারের আয়োজন করে।

● বিজ্ঞপ্তি

আসাম রাইফেলস্-এর ত্রিদেশীয় মোটর সাইকেল অভিযাত্রা

আসাম থেকে ভারতীয় রাইফেলসের ত্রিদেশীয় মোটরসাইকেল অভিযাত্রা ডাউকি-তামাবিল সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে। আসাম রাইফেলসের ১৮৩তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে গত অক্টোবর মাসে এ অভিযাত্রা পরিচালিত হয়। এটি বাংলাদেশসহ ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য ও মিয়ানমার পরিভ্রমণ করে। এ অভিযাত্রায় আসাম রাইফেলসের কর্মকর্তা ও সৈনিকসহ ১৪টি মোটরসাইকেল ও সাপোর্ট যানবাহন ভারতের শিলং সীমান্তে অবস্থিত বাংলাদেশের আখাউড়া, শ্রীমঙ্গল ও সিলেট অঞ্চল সফর করে। অভিযাত্রিকদলটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি-বিজড়িত কিছু ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শন এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁরা বিজিবি-র সঙ্গে একযোগে সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কার্যক্রমেও অংশগ্রহণ করেন।

আসাম রাইফেলসের ডিজি লে. জেনারেল শকিন চৌহান, এভিএসএম, ওয়াইএসএম, এসএম, ভিএসএম অভিযাত্রিকদলের সঙ্গে তিন দিনের সফরে সিলেটে আসেন। সফরকালে তিনি বিজিবি-র ডিজি ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ১৪১তম জন্মবার্ষিকী পালন উপলক্ষে আয়োজিত 'রাষ্ট্রীয় একতা দিবস' অনুষ্ঠানে শপথ গ্রহণ পরিচালনা করেন। এ উপলক্ষে ঢাকায় বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী সমিতি এক আলোচনা অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে প্রধান ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে মাননীয় শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু এমপি ও ভারতের হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা

৩১ অক্টোবর ২০১৭

রাষ্ট্রীয় একতা দিবসে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ

সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ভারতের সেইসব বিরলপ্রজ রাজনীতিকদের অন্যতম যিনি কর্মনিষ্ঠা, সততা, একাগ্র অধ্যবসায় এবং লৌহকঠিন দৃঢ়তায় আজকের ভারত বিনির্মাণে এক অনন্য সাধারণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। ১৯৪৭-এ দেশভাগের সময় পাকিস্তানের সঙ্গে বৈরিতা মোকাবেলায় তিনি ছিলেন কার্যত সেনানায়ক। দেশের ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখার ক্ষেত্রে তাঁর নিরলস পরিশ্রম ও কঠোর আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করে সরকার ২০১৪ সাল থেকে তাঁর জন্মদিনকে 'রাষ্ট্রীয় একতা দিবস' হিসেবে পালন করে আসছে। ১৯৯১ সালে তাঁকে 'ভারতরত্ন' সম্মানে ভূষিত করা হয়।

বল্লভভাই প্যাটেলের 'সর্দার' উপাধিটি দিয়েছিলেন তাঁর রাজনৈতিক গুরু মহাত্মা গান্ধী নামে সমাধিক পরিচিত মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্ম ১৮৭৫ সালের ৩১ অক্টোবর গুজরাটের নাদিয়াডের এক চাষী পরিবারে। তাঁর বাবার নাম জাবেরভাই প্যাটেল। মায়ের নাম লাডবাঈ। জাবেরভাই ছিলেন ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাঈয়ের সেনাবাহিনির একজন সদস্য। মা ছিলেন ধর্মশীলা সাধারণ গৃহবধূ।

ছোটবেলা থেকেই বল্লভভাই ছিলেন কঠোর পরিশ্রমী। তার প্রাথমিক শিক্ষার সূচনা গুজরাটে। পড়াশুনোর পাশাপাশি তিনি বাবাকে কৃষিকাজে সাহায্য করতেন। সেকালের রীতি অনুযায়ী অল্প বয়সে ১৮৯১ সালে তাঁর বিয়ে হয়। তাঁর স্ত্রীর নাম জাবেরবাঈ। ১৯০৪ সালে তাঁদের প্রথম কন্যা মণিবেনের জন্ম হয়। এর পরের বছর একমাত্র পুত্রসন্তান দয়াভাইয়ের জন্ম হয়। ১৯০৯ সালে জাবেরবাঈ শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। স্থানীয় পড়ালেখা শেষ করে বল্লভভাই উচ্চশিক্ষার জন্য ইংল্যান্ডে যান এবং ১৯১৩ সালে ব্যারিস্টারি পাশ করে দেশে ফিরে আসেন।

দেশে থাকতে স্কুল জীবনেই তার রাজনীতিতে হাতেখড়ি হয়। দেশে ফিরে বল্লভভাই কিছুদিন আইনব্যবসায়ে জড়িত ছিলেন। তখন ভারতজুড়ে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন তুঙ্গে। ফলে রাজনৈতিক মামলা লড়তে হত। তিনি অচিরেই সক্রিয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। ১৯১৮ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করেন।

তিনি ছিলেন গান্ধীজীর ভাবশিষ্য। কাজেই অচিরেই তিনি গান্ধীজীর ঘনিষ্ঠ সহচর হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। ১৯৩১ সালে তিনি কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন এবং বিখ্যাত 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন।

১৯৪৭-এ উপমহাদেশ বিভক্ত হওয়ার মধ্য দিয়ে ভারত স্বাধীন হলে তিনি প্রথম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ছিলেন ভারতের প্রতিষ্ঠাতা নেতৃবৃন্দের অন্যতম– তাই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের পাশাপাশি উপ-প্রধানমন্ত্রীর গুরুদায়িত্বও তাঁকে পালন করতে হয়। সদ্য স্বাধীন ভারতের বিভিন্ন অংশের অখণ্ডতা রক্ষা এবং বিভক্ত ভারতকে শৃঙ্খলাবদ্ধ রাখতে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি অচিরেই লৌহমানব বলে পরিচিত হন। তবে এসব দায়িত্বপালনে যে মানসিক চাপ তাঁকে সামলাতে হয়, তাতে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ১৯৫০ সালে ১৫ ডিসেম্বর মুম্বইয়ে ভারতের এ কৃতি সন্তান ৭৫ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।

● নিজস্ব প্রতিবেদন

৩১ অক্টোবর ২০১৭ হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলার বাংলাদেশের মুন্সীগঞ্জ জেলার আউটশাহী সিলেমপুরে স্কুল ভবন নির্মাণের জন্য ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক সই

বাংলাদেশ-ভারতের প্রধানমন্ত্রীদের রেল প্রকল্প উদ্বোধন

৯ নভেম্বর ২০১৭ ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদি এবং বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে যৌথভাবে কলকাতার চিৎপুরে আন্তর্জাতিক রেল যাত্রী টার্মিনাসের উদ্বোধন করেন। তাঁরা পতাকা দেখিয়ে কলকাতা-খুলনা বন্ধন এক্সপ্রেসের উদ্বোধনী যাত্রারও সূচনা করেন। কলকাতা থেকে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সুশ্রী মমতা ব্যানার্জিও এ ভিডিও কনফারেন্সে যোগ দেন।

দুই প্রধানমন্ত্রী কলকাতা-ঢাকা মৈত্রী এক্সপ্রেসের দুই প্রান্তে কাস্টমস্ ও ইমিগ্রেশন সেবা শুরুরও ঘোষণা দেন। যাত্রীদের অসুবিধা এড়াতে এবং ভ্রমণের সময় কমিয়ে আনতে ভারতীয় অংশে কাস্টমস এবং ইমিগ্রেশন আনুষ্ঠানিকতা কলকাতার চিৎপুরের আন্তর্জাতিক রেল যাত্রী টার্মিনাস-এ সম্পন্ন হবে। এর ফলে ঢাকা থেকে কলকাতায় ট্রেন ভ্রমণে তিন ঘণ্টার মত সময়ের সাশ্রয় হল।

ভারতীয় ঋণরেখায় নির্মিত ভৈরব ও তিতাস দুই রেলসেতুর উদ্বোধন

দুই প্রধানমন্ত্রী যৌথভাবে ভারতীয় ঋণরেখায় নির্মিত ২টি রেলওয়ে সেতুরও উদ্বোধন করেন। বাংলাদেশের মেঘনা নদীর ওপর ১ কিলোমিটার দীর্ঘ ভৈরব রেলসেতু এবং তিতাস নদীর ওপর দ্বিতীয় রেলসেতু নির্মাণে প্রায় ১০ কোটি মার্কিন ডলার ব্যয় হয়। এই সেতু দুটি নির্মাণের ফলে ঢাকা ও চট্টগ্রামের মধ্যে রেলপথে যাত্রা সহজতর হবে। বাংলাদেশ ভারতের দীর্ঘদিনের উন্নয়ন অংশীদার। ৩টি ঋণরেখার আওতায় ভারত এ পর্যন্ত বাংলাদেশকে ৮০০ কোটি ডলারের সহজ-শর্ত ঋণ দিয়েছে। উদ্বোধনকৃত রেলসেতু দুটি ছিল প্রথম ঋণরেখার প্রকল্প।

কলকাতা-খুলনা 'বন্ধন এক্সপ্রেস'-এর বাণিজ্যিক চলাচলের উদ্বোধন

১৬ নভেম্বর ২০১৭ থেকে প্রত্যেক বৃহস্পতিবার 'বন্ধন এক্সপ্রেসে'র কলকাতা ও খুলনার মধ্যে চলাচল শুরু হওয়ায় কলকাতার সঙ্গে সরাসরি ট্রেন সার্ভিস চালু করার বাংলাদেশের খুলনার মানুষের দীর্ঘ দিনের দাবি পূরণ হল। সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বন্ধন এক্সপ্রেস দুই দেশের মধ্যে বন্ধুত্ব ও বিশ্বাসের প্রতীক। মৈত্রী ও বন্ধন এক্সপ্রেস ট্রেন দুটি ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে মানুষে মানুষে যোগাযোগ বৃদ্ধি করেছে। এতে ট্রেন যাত্রীদের যাত্রা আরো সহজতর এবং সময়সাশ্রয়ী হল।

খুলনা-কলকাতা 'বন্ধন এক্সপ্রেস'-এর বাণিজ্যিক চলাচলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে হাই কমিশনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা উপস্থিত ছিলেন। ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের উদ্বোধন করা 'বন্ধন এক্সপ্রেস' ভারত এবং বাংলাদেশের জনগণের প্রতি উৎসর্গ করা হয়। ৫২ বছর পর ১৯৬৫ সালের পূর্বে দুই দেশের মধ্যে যে রেল সংযোগ ছিল তা 'বন্ধন এক্সপ্রেস' উদ্বোধনের মাধ্যমে পুনঃস্থাপিত হল। এটি সে-সময় 'বরিশাল এক্সপ্রেস' নামে শিয়ালদহ থেকে খুলনা পর্যন্ত চলাচল করত। হাই কমিশনার শ্রী শ্রিংলা খুলনা-কলকাতা 'বন্ধন এক্সপ্রেস'-এর যাত্রীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন।

● নিজস্ব প্রতিবেদন

মধুকবির জন্মভূমি সাগরদাঁড়িতে হাই কমিশনার শ্রী শ্রিংলা

ভারতীয় হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা যশোরের কৃতি সন্তান মাইকেল মধুসূদন দত্তের বাড়ি (এখন এটি জাদুঘর) সাগরদাঁড়ি পরিদর্শন করেন। বাংলার নবজাগরণের অন্যতম পুরোধা মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা সাহিত্যে সনেট ও অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন করেন এবং বাংলায় প্রথম মহাকাব্য *মেঘনাদবধ কাব্য* রচনা করেন

ভারতে শিক্ষাগ্রহণকারীদের অ্যালামনাই এসোসিয়েশন ‘মৈত্রী’র উদ্বোধন

ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশন ভারতে পড়াশোনা করা বাংলাদেশী শিক্ষার্থীদের নিয়ে ‘মৈত্রী’ নামে একটি অ্যালামনাই এসোসিয়েশন গঠন করেছে। প্রতিবছর যে-সব বাংলাদেশী শিক্ষার্থী বিজ্ঞান, প্রকৌশল, শিল্পকলা, ব্যবসায় শিক্ষাসহ বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে ভারতে যান এবং ভারতীয় জীবনধারা ও দুই দেশের সাধারণ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জ্ঞাললাভ করে উচ্চ শিক্ষা শেষে বাংলাদেশে ফিরে দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখেন, তাদের নিয়েই এ অ্যালামনাই গঠিত হল। এঁদের অনেকেই তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ভারত ও বাংলাদেশের বন্ধুত্বের বার্তা পৌঁছে দেন।

এঁদের ভূমিকার কথা মনে রেখেই ভারতে পড়াশোনা করা শিক্ষার্থীদের সাধারণ প্ল্যাটফর্ম হিসেবে অরাজনৈতিক ও অবাণিজ্যিক সংগঠন ‘মৈত্রী’র সূচনা হল। ভারতে অধ্যয়নরত ও প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে সহায়তা করা সংগঠনটির লক্ষ্য। এছাড়াও সংগঠনের বর্তমান ও ভবিষ্যত সদস্যদের সামাজিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও আত্মিক চাহিদা পূরণে সহায়ক হবে ‘মৈত্রী’। ‘মৈত্রী’ তার কাজের মাধ্যমে বাংলাদেশের সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করবে। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ইতিহাস ও সংস্কৃতির অংশীদারত্বের কারণে গড়ে ওঠা বন্ধুত্বপূর্ণ ও সহযোগিতাপূর্ণ সম্পর্ক জোরদার করতে কাজ করবে সংগঠনটি। ‘মৈত্রী’র লক্ষ্য: সংযোগ স্থাপন, যুক্ত করা, সফলতা ও উদযাপন।

৩০ নভেম্বর ঢাকায় ভারতীয় হাই কমিশনে সন্ধ্যায় ‘মৈত্রী’র আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। ভারতীয় হাই কমিশনের সহায়তায় আয়োজিত এ অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলাসহ ‘মৈত্রী’র সদস্য ও শুভাকাঙ্ক্ষীরা অংশ নেন। হাই কমিশনার বাংলাদেশের উন্নয়ন এবং ভারত ও বাংলাদেশের মানুষের মধ্যেকার সম্পর্ক এগিয়ে নিতে তরুণদের ভূমিকার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি ভারতীয় হাই কমিশনের সাম্প্রতিক নানা উদ্যোগের কথা তুলে ধরেন এবং ‘মৈত্রী’র ভবিষ্যৎ প্রচেষ্টায় সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেন।

● নিজস্ব প্রতিবেদন

কক্সবাজারে ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোর যৌথ নৌ মহড়া অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ নৌবাহিনির তত্ত্বাবধানে ২৬-২৯ নভেম্বর ২০১৭ কক্সবাজারে ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোর যৌথ নৌ মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। এতে ভারতীয় নৌবাহিনি চারটি জাহাজ ও একটি সামুদ্রিক টহল বিমানের সঙ্গে সর্বাধিক নৌসেনা নিয়ে যোগ দেয়।

মহড়ায় যোগদানের জন্য ভারতীয় নৌবাহিনির জাহাজ আইএনএস রণবীর, আইএনএস সায়াদ্রি, আইএনএস ঘড়িয়াল ও আইএনএস সুকন্যা ২৫ নভেম্বর কক্সবাজারে পৌঁছয়। সামুদ্রিক টহল বিমান ‘পি৮আই’ও চট্টগ্রাম বিমানবন্দরে আসে। এটি নৌবহর পর্যালোচনা, অনুসন্ধান এবং উদ্ধার মহড়ায় অংশগ্রহণ করে।

ভারতীয় নৌবাহিনি প্রধান অ্যাডমিরাল সুনীল লানবা, পিভিএসএম, এসিএসএম, এডিসি ২৬ নভেম্বর পৌঁছন এবং এ বহুজাতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। ২৮ নভেম্বর তিনি বাহিনিপ্রধানদের এক বিশেষ বৈঠকে অংশ নেন। ভারতীয় নৌবাহিনি প্রধান বাংলাদেশ নৌবাহিনি প্রধানকে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের কিছু সামুদ্রিক স্মারক প্রদান করেন।

● নিজস্ব প্রতিবেদন

মুক্তিযুদ্ধ

স্মৃতিচিহ্ন একাত্তর

শেখর দত্ত

‘তোমাদের দেশের সাথে আমাদের দেশ পাঞ্জাবের যেমন মিল রয়েছে, অমিলও কিন্তু কম নয়।’ বীরদীপ্ত গর্বিত মুখমণ্ডলে এখন কালো ছায়া। দীর্ঘনিঃশ্বাস দীর্ঘতর হল। ব্রহ্মপুত্রের দিকে তার স্থির দৃষ্টি। মুখে কোন কথা নেই। কল্পনায় যেন কিছু দেখছে মেজর অর্জুন সিং।

‘আমি তোমাদের দেশে যাইনি। তবে দেশ কি একটাই ছিল না?’ ঈষৎ হেসে, একটু থেমে নির্বাক আনমনা বন্ধুটিকে কথার মধ্যে টেনে আনতে চাইল আনোয়ার। একদিকে গতদিনের যুদ্ধ বিজয়ের অভূতপূর্ব শিহরণ-আনন্দ, ওপরদিকে আগামী দিনের যুদ্ধের শঙ্কা-উদ্বেগ। সমান তালে চলছিল দু’বন্ধুর মুখ। অর্জুনের হঠাৎ নীরবতায় আনোয়ার বেশ অস্বস্তিতে পড়ল। কিন্তু পরিস্থিতি সহজ করার কৌশল তার জানা। সে বলতে থাকল, ‘হ্যাঁ, বাংলা যেমন ভাগ হয়েছিল, ঠিক তেমনি কলমের খোঁচায় ব্রিটিশরা পাঞ্জাবকেও ভাগ করতে দ্বিধা করেনি। দু’জায়গাতেই হয়েছে ভয়াবহ ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা। বিপুলসংখ্যক মানুষ ভিটেমাটি ছেড়ে দেশান্তরী হয়েছে। দুটোই পূর্ব-পশ্চিমে দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে। তোমরা আগেই পূর্ব শব্দটা বাদ দিয়েছ।

‘তোমরা যারা এখানে আছ, তারা সকলেই এই এলাকার। সকলের কাছ থেকে যতটুকু পার রাস্তাঘাট, কোথায় কি আছে তার খবর নিতে হবে। আত্মীয়-স্বজনদের বাড়ি-ঘর কোথায়? তারা আমাদের শত্রু না মিত্র?

এখন আমাদেরও ওই শব্দটা আর থাকবে না। ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামেও বাংলা-পাঞ্জাব একসাথে লড়াই করেছে। এসব মিল ছাড়া অন্য কোন মিল কী ছিল বা আছে? তবে অমিল তো আছেই। আমাদের দেশের সংখ্যাগুরুরা আল্লাহর উপাসনা করে আর মাথায় টুপি পরে। আর তোমরা...’ কথাটা শেষ না করে আনোয়ার বন্ধুর পাগড়ির দিকে ইঙ্গিত করল। এটি নিয়ে অর্জুনের দুর্বলতার কথা তার জানা। আনোয়ার স্থির নিশ্চিত, এখন অর্জুন আর নীরব থাকবে না।

‘পাগড়িকে কি বলে জান, কাছা। এরকম প্রথম অক্ষর ‘ক’ দিয়ে আরো পাঁচটি জিনিস আছে। পাঞ্জাবি পুরুষদের ওই জিনিসগুলো অবশ্যই ধারণ করতে হবে। পঞ্চনদের দেশ পাঞ্জাব। পাঁচ সংখ্যাটি তাই খুব পবিত্র, প্রিয়ও। অবশ্য এখন আর আমাদের পাঞ্জাবে পাঁচটি নদী নেই, আছে তিনটি।’ দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে অর্জুন বলতে থাকে, ‘তাতে কি! পাঁচ আমাদের সাথেই থাকে। ওইগুলো এখনও কেউ ছিনিয়ে নিতে পারেনি। এই পাঁচকে বলে কাকরস্। কেশ, কানঘা, কারা, কৃপাণ আর কাছা। কাছা, যাকে বলে পাগড়ি তা তোমরা দেখতে পাও। কিন্তু চুল, হাঁড়ের চিরুনি, স্টিলের কঙ্কন, তরবারি– এ চার অদৃশ্য। অর্জুন সিং অনেকটা মজা করে পকেট থেকে একটা চিরুনি বের করে আনোয়ারকে দেখায়। কিন্তু একি? অর্জুন আবারো নীরব। আষাঢ় মাসের মেঘ কেন অর্জুনের মুখমণ্ডলে? একটা হাঁই তুলে গলার স্বর বেশ নরম করে সে বলল, ‘তুমি আমার বন্ধু। তোমাকে বলতে দ্বিধা নেই। ভারতের মধ্যে অনেক শিখ এখন নিজেদের সংখ্যালঘু ভাবে।’ অর্জুনের মুখটা আবারও মলিন হল।

‘আমাদের দেশে এরকমটা হবে না। মুসলিম-হিন্দু-খ্রিস্টান-বৌদ্ধ সব সম্প্রদায় মিলেমিশে আমরা যুদ্ধ করছি। বাংলাদেশে কাউকে সংখ্যালঘু হয়ে থাকতে হবে না। সবাই আমরা বাঙালি।’ দৃঢ় কণ্ঠে আনোয়ার বলে ওঠে।

অর্জুন সিং আর আনোয়ার হোসেন জিপে করে ময়মনসিংহ শহরে ঘুরছিল। মাত্র কিছুক্ষণ আগে শহরটি পাকিস্তানি হানাদার বাহিনির কবলমুক্ত হয়েছে। ভারতীয় বাহিনির ১০১ নম্বর কমিউনিকেশন জোনের একটা ব্রিগেড শহরকে মুক্ত করেছে। সঙ্গে রয়েছে মুক্তিবাহিনির ছোট একটি দল। অর্জুন ওই ব্রিগেডের মেজর। আনোয়ার মুক্তিবাহিনির কমান্ডার। ভাওয়াল কলেজের পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিল সে।

ট্রেনিং শেষ হবার পর আনোয়ারের নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনির দলটিকে নিয়ে আসা হয়েছে মেঘালয় রাজ্যে। তিন মাস আসামের জঙ্গলে ট্রেনিং নিয়েছে। এখন সেপ্টেম্বরের শেষ। সবে শীত পড়তে শুরু করছে। গারো পাহাড়ের জঙ্গলে ওদের ক্যাম্প। নির্দিষ্ট এলাকা ছেড়ে বাইরে যাওয়া মানা। থাকার স্থানটি গোপন রাখার বিষয়ে সকলকে সজাগ করে দেওয়া হয়েছে। চারদিকে পাহাড় আর ঘন বন। মাঝে ছোট এক সমতল ভূমি। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। বেশ কয়েকটা তাঁবু। আনোয়ারের একঘেঁয়ে দিন অসহ্য মনে হতে থাকে। কবে যুদ্ধে যাবে তারা?

সারাদিন ব্যস্ততার মধ্যে কেটে যায় আনোয়ারের। কিন্তু রাতে ঘুম আসে না। দেশ মুক্ত হবে কবে? রোজিনার কথা মনে পড়ে। তার আত্মজ দেখতে কেমন? কত বড় হয়েছে? আনোয়ার ভাবতে পারে না।

ভোর ছ'টা থেকে শুরু হয় পিটি। তারপর নাস্তা খাবার এক ঘণ্টা বিরতি। এক ঘণ্টা প্যারেড, দুই ঘণ্টা ক্লাস। এগারোটা থেকে চারটা পর্যন্ত খাওয়া-বিশ্রাম-পড়াশোনা। বিকেলে গেরিলা ট্রেনিং। কিছুক্ষণ প্যারেড। রাতে খাওয়ার পর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ফাঁকে ফাঁকে নিউজ শোনা। যুদ্ধের খবরে ওদের হাত নিশপিশ করে। ওরা অস্থির হয়ে ওঠে। যুদ্ধে যেতে চায় ওরা, কিন্তু কিছুই করার নেই। কি প্রয়োজনে ওদের আনা হয়েছে তা ওরা জানে না। বাংলাদেশের কারো সঙ্গে ওদের কোন যোগাযোগ নেই। ভারতীয় মিত্র বাহিনির গভীর পর্যবেক্ষণ আর হেফাজতে রয়েছে ওরা।

একদিন সকালে আনোয়ারকে ডালু বাজারে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানেই পরিচয় সমবয়সী অর্জুন সিংয়ের সঙ্গে। প্রথম পরিচয়েই নৈকট্য বেড়ে যায়। আলোচনা চলে রাস্তাঘাট নিয়ে। হালুয়াঘাট থেকে ময়মনসিংহ হয়ে কি কি ভাবে ঢাকা যাওয়া যায়। অর্জুনের মুখে শহর বা স্থানের নামগুলো শুনে বিস্মিত হয় আনোয়ার। এত-সব জানে কিভাবে অর্জুন! উচ্চারণ ঠিক করে দেয় সে। অর্জুন হাসে।

‘তোমরা যারা এখানে আছ, তারা সকলেই এই এলাকার। সকলের কাছ থেকে যতটুকু পার রাস্তাঘাট, কোথায় কি আছে তার খবর নিতে হবে। আত্মীয়-স্বজনদের বাড়ি-ঘর কোথায়? তারা আমাদের শত্রু না মিত্র? সকলের সাথে আলাদাভাবে আলোচনা করে সবটা জানতে হবে। আমি আগামী সপ্তাহে আসব, তোমাদের কাছ থেকে খুঁটিনাটি সব শুনব।’ করমর্দন করে অর্জুন চলে যায়। কাজ পেয়ে আনোয়ারের চোখে-মুখে কৃতজ্ঞতা ঝরে পড়ে। সে ভাবে, এবার বোধ করি প্রতীক্ষার শেষ হবে।

অর্জুনের সঙ্গে আনোয়ারের প্রায়ই দেখা হয়। কথাবার্তা হয় যুদ্ধের স্ট্রাটেজি নিয়ে। ব্যক্তিগত জীবনও বাদ পড়ে না। দু'জনের আবেগ-অনুভূতি যেন একই সুরে বাঁধা। আর বাস্তব জীবন, এতটা মিল কেমন করে হয়? সদ্যোজাত পুত্রের মুখ দু'জনের কেউই দেখেনি। সমব্যাথী, তাই বন্ধুত্ব গাঢ় হয় দ্রুতই। অর্জুন বলে, ‘ছেলেকে তুমি দেখবে আগে, মুক্ত স্বাধীন স্বদেশে। ভাবিকে কিন্তু মিঠাই খাওয়াতে হবে। আমি যাব তোমাদের বাড়ি।’ আনোয়ার বলে, ‘অবশ্যই। এ আর এমন কি? আমাকে নেবে না তোমাদের বাড়ি?’

দুই.

ডিসেম্বর এসে গেছে। প্রচণ্ড শীত পড়েছে। হাড় কাঁপানো। গাছের পাতা ঝরে পড়ছে। এমন ছোট দিন, সূর্য থাকতেই চায় না। পাহাড়ে-বনে দ্রুতই অন্ধকার নেমে আসে। অর্জুন এখন প্রায়ই আসে আনোয়ারদের ক্যাম্পে। একসঙ্গে দীর্ঘ সময় কাটায়। গল্প তাদের ফুরায় না। কখনও একজন অপরজনকে খেপায়, টিটকারি দেয়, আবার সহানুভূতিতে একাত্ম হয়ে পড়ে। কখনও তাস চলে, দাবাও বাদ যায় না। দু'জনে পাঞ্জাও লড়ে। অর্জুন সিংয়ের অমিত শক্তি, আনোয়ার পারবে কিভাবে? কিন্তু তাস খেলায় আনোয়ার জেতে। অর্জুনের কাছে সে দাবা শেখে।

আনোয়ার জানে প্রতি রাতে অর্জুন ডাইরি লেখে। ‘কি লিখছ’ জিজ্ঞেস করলে কখনও হেসে বলে, ‘বীরত্বগাথা লিখে রাখছি। তোমার ভাবিকে পড়াব। আমাদের দেশে রমণীরা বীর যোদ্ধাকে পছন্দ করে। তুমি জান কি, তোমাদের দেশে কী পছন্দ? দেখবে এবার, অধ্যাপক থেকে যোদ্ধাকেই ভাবির পছন্দ হবে বেশি।’ আবার কখনও বলে, ‘আমার জীবনের সবচেয়ে গৌরবের ঘটনা কি ছেলেকে জানাতে হবে না? দেশের হয়ে যুদ্ধ করছি। ছেলে তা জানবে। তাকেও কি দেশপ্রেমিক হতে হবে না? সে জন্যেই ডায়রি লিখছি।’

অর্জুন কয়েকদিন ক্যাম্পে আসেনি। সে গৌহাটি গেছে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ তাকে ডেকে পাঠিয়েছে। ফিরে এল দোসরা ডিসেম্বর। চলাফেরা, কথাবার্তা এখন অন্য রকম। যোদ্ধা ছাড়া কিছুই সে নয়। পরদিন মুক্তিযোদ্ধাদের একত্র করে প্যারেডে অর্জুন বলে, ‘পাকিস্তান সম্পূর্ণ যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। ওয়ার ইজ অন। এখন হিট ব্যাক করতে হবে উইথ অল মাইট। পাকবাহিনি ভারত সীমান্ত অতিক্রম করে পশ্চিম বাংলা, ত্রিপুরা, আসামের গ্রামগুলোর উপর মর্টার হামলা করছে। ভারতের মাটি দখল করতে চাইছে। ওরা যুদ্ধ করতে চায়। সামনাসামনি যুদ্ধ না করে এখন

আর অন্য কোন পথ নেই। হিট ব্যাকের সাথে তীব্র গতিতে আমাদের ঢাকা মুক্ত করে নিতে হবে। এখানে-ওখানে যথাসম্ভব যুদ্ধ এড়াতে হবে। যুদ্ধে ক্ষয়ক্ষতি বাড়বে, মানুষ মরবে। নদ-নদী থাকায় অন্য সীমান্তের দিক থেকে ঢাকাতে প্রবেশ সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। তাই এই অঞ্চল দিয়ে আমাদের দ্রুততার সঙ্গে অগ্রসর হতে হবে। সবাই রওয়ানা দেওয়ার প্রস্তুতি নিন। এবার যুদ্ধে নামতে হবে।'

অর্জুন-আনোয়ারদের সম্মিলিত বাহিনিটি হালুয়াঘাট সীমান্তে পর পর চারদিন অপেক্ষা করল। কিন্তু কেন? মুক্তিবাহিনির দলটি তা জানতে পারে না। তবে শুনতে পেল, তাদের পশ্চিম-দক্ষিণে জামালপুরে আর পূর্ব-দক্ষিণে ভৈরবে লড়াই হচ্ছে। আটই ডিসেম্বর হালুয়াঘাট সীমান্ত পার হতেই দেখা গেল এলাকা শত্রুমুক্ত, বাধা নেই। বাহিনিটি দ্রুত এগিয়ে গেল ময়মনসিংহের দিকে।

দশই ডিসেম্বর ময়মনসিংহ মুক্ত হল। দাবানলের মত এ খবর ছড়িয়ে পড়তে লাগল। রাস্তায় মানুষের সমাগম ক্রমেই বাড়ছে। বাড়িতে বাড়িতে জয় বাংলার পতাকা উড়ছে। এত পতাকা শত্রু কবলিত এলাকায় ছিল কিভাবে? এদিক-ওদিক 'জয় বাংলা', 'বঙ্গবন্ধুর মুক্তি চাই' স্লোগান উঠছে।

অর্জুন ও আনোয়ার জিপ নিয়ে শহর প্রদক্ষিণে বের হয়েছে। শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় মুক্তিবাহিনি ও জনতাকে এলাকাভিত্তিতে দায়িত্ব দিতে হবে। জিপ কোথাও কোথাও গিয়ে থামানো হয়। আনোয়ার আনন্দমোহন কলেজের ছাত্রনেতা ছিল। নির্দেশমাফিক সবটা গুছিয়ে তুলতে আনোয়ারের একটুও কষ্ট হচ্ছে না।

মানুষ অর্জুনের দিকে কৃতজ্ঞতার চোখে তাকায়। শ্রদ্ধায় হাতও মেলায়। ভালবাসায় তাকে সিক্ত করে তোলে। অর্জুন পরিতৃপ্ত, গর্বিত। মুখে তার খৈয়ের মত কথা ফুটছে। মিল-অমিলের কথাগুলো বলার সময়েই সে কিছুটা অন্যমনস্ক হয়ে ছিল। এক সময় অর্জুন বলে, 'শহরের দোকানগুলোতে সাইনবোর্ড এত কম কেন? দোকানের নাম নেই? কোথাও রাস্তার নাম লেখা নেই কেন? এই রাস্তার নাম কি জানার উপায় আছে?'

'বাংলায় লেখা ছিল সাইনবোর্ডগুলো। তাই দখলদার বাহিনির ভয়ে ওগুলো নেই। আর যারা সাইনবোর্ড তুলছে, তারাও রাস্তার নাম লেখেনি। কেন-না হিন্দু দেবীর নামে রাস্তা। দুর্গাবাড়ি রোড। এই রাস্তায় দেবী দুর্গার মন্দির আছে। পাকবাহিনির ভয়ে রাস্তার নাম ওরা লেখেনি।' আনোয়ারের মুখ থেকে কথাটা বের হতে না হতেই অর্জুনের মুখমণ্ডল আনন্দের আতিশয্যে উদ্বেল হয়ে উঠল।

'কি বললে! দেবী দুর্গার মন্দির! দুর্গাবাড়ি রোড! কি আশ্চর্য! আমাদের শহর অমৃতসরেও আছে দেবী দুর্গার মন্দির। স্থানীয় লোকেরা বলে, দুর্গিয়ানা মন্দির। আমাদের বাড়ির পাশে স্বর্ণ মন্দির আর রেল স্টেশনের মাঝখানে অলিগলি পথ। মর্মর পাথরে দেবী দুর্গার মন্দির। ছোটবেলায় কত গিয়েছি ওই মন্দিরে। দেওয়ালিতে দীপসজ্জা হয় সেখানে। সেদিন আতসবাজি পোড়ানো হয়। তুমি কি আমাকে এখানকার মন্দিরে নিয়ে যাবে? মিল অমিল আমি খুঁজে নেব।' মিনতির সুর অর্জুনের, যেন সে এক বালক।

জিপ দুর্গাবাড়ির দিকে যাচ্ছে। অর্জুন স্মৃতি রোমন্থন করে চলছে। এক সময় সে আরো বিস্মিত হয়ে বলে ওঠে, 'জান! ওখানকার পুরোহিতরা বংশ পরম্পরায় বাঙালি। কবে, কখন ওরা পাঞ্জাবে গিয়েছিল, তা অবশ্য আমি জানি না। বৃদ্ধ বাঙালি পুরোহিতকে আমি চিনতাম। তিনি প্রসাদ বিলাতেন। তিনি কি এখনও বেঁচে আছেন? জানি না?' অর্জুনের চোখ সজল হয়ে ওঠে।

একশ' বছরের পুরনো দুর্গামন্দির। আনোয়ার জিপ থেকে নামতে নামতে বলে, 'তুমি হতাশ হবে। এ মন্দির মর্মর পাথরের নয়। তবে ঐতিহ্য আছে। মুসলিমরাও পুজোর দিনগুলোতে এ মন্দিরে আসে। এখন কি পরিচিত কাউকে এখানে খুঁজে পাওয়া যাবে?'

দু'জন মন্দির প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়ায়। চারদিক লণ্ডভণ্ড। দরজা-জানালা নেই। সব লুট হয়ে গেছে। আনোয়ার গ্রন্থাগারের দিকে অগ্রসর হয়। পিছনে অর্জুন। কিন্তু একি? প্রাচীন বই, তুলোট কাগজে লেখা দলিলপত্র, তালপাতায় লেখা দুর্লভ পাণ্ডুলিপি কিছুই নেই। আগুনের চিহ্ন এখনও রয়ে গেছে। সব পুড়ে ছাই। ওতে পাকবাহিনি ও শান্তিবাহিনির দালালরা আগুন ধরিয়েছিল। তারা বিচলিত হয়ে পড়ে। পরিবেশ হালকা করার জন্যে অর্জুন বলে, 'এখানে লক্ষ্মী-নারায়ণের বিগ্রহ নেই? আমাদের ওখানকার মন্দিরে আছে। ইতোমধ্যে কিছু মানুষ সেখানে এসেছে। তবে হিন্দু সম্প্রদায়ের কেউ নেই। তাই এ প্রশ্নের উত্তর কেউ দিতে পারে না।

বেশিক্ষণ দু'বন্ধু ওখানে থাকতে পারল না। কাজ সেরে দ্রুত ফিরতে হবে ক্যাম্পে। মুখোমুখি যুদ্ধ এখনও ওদের করতে হয়নি। নির্বিঘ্নে ময়মনসিংহ মুক্ত হয়ে যাওয়ায় যুদ্ধ কি তা বোঝেনি আনোয়ার। ওরা বেশ আবেগতাড়িত হয়ে উঠেছিল মন্দিরে। আনোয়ার ভাবত, যুদ্ধের সময় আবেগ-অনুভূতি মরে যায় যোদ্ধাদের। নতুবা মানুষ মানুষকে মারে কিভাবে? এখন সে জানে, যুদ্ধের সময়ও আবেগ-অনুভূতি মরে না। দেশের জন্যে মরণপণ যুদ্ধ করাও তো সম্ভব হয় আবেগের জন্যেই। আবেগ-অনুভূতিই একজনকে যুদ্ধংদেহী বীর করে তোলে। যে পক্ষের মনোবল যত বেশি, সেই পক্ষের বিজয়ী হবার সম্ভাবনাও তত বেশি।

তিন.

ক্যাম্পে এসেই ওরা শুনতে পেল, বাহিনিকে এখনই টাঙ্গাইলের দিকে অগ্রসর হতে হবে। তবে আনোয়ারকে থাকতে হবে ময়মনসিংহে। মুক্ত ময়মনসিংহে বানের মত মানুষ আসছে। শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার কাজ এখন গুরুত্বপূর্ণ। ভারতীয় সৈন্যদের কিছু অংশ ওখানে থাকবে। পিছনে আরো আসছে।

মেজর অর্জুন সিংয়ের সঙ্গে আনোয়ার খুব একটা কথা বলার সময় পেল না। দু'বন্ধু যখন শেষ বিদায়ের মুহূর্তে করমর্দন করছে, তখন আনোয়ার বলে উঠল, 'বন্ধু আবার দেখা হবে। তুমি তো ঢাকা যাচ্ছ। পথেই আমার বাড়ি। টঙ্গী বাজারে গিয়ে আমার নাম বললে সবাই চিনবে। বাড়ি খুঁজে নিতে তোমার কোন কষ্ট হবে না। আমাকে বাদ দিয়ে তোমার ভাবির কাছে বিজয়ের মিঠাই আগাম খেয়ে যেও। আর আমার ছেলেকে দেখে নিও।' আনোয়ারের চোখে জল। অর্জুনকে নিরুদ্বিগ্ন দেখাল। কোন কথাই সে বলল না। আনোয়ার পকেট থেকে রুমাল বের করে চোখ মুছল।

দ্রুততার সঙ্গে যৌথবাহিনি অগ্রসর হচ্ছে টাঙ্গাইলের দিকে। আনোয়ারের দলটিরও কেউ কেউ আছে ওই বাহিনির সঙ্গে। হঠাৎ সংকেত দেওয়া হল। পাক সেনারা ওই পথে টাঙ্গাইল থেকে পিছু হটছে। টাঙ্গাইলে ভোর রাতে ছত্রীসেনা নেমেছে। ওদের অতর্কিত আক্রমণ পাকবাহিনি সইতে পারেনি। ওরা পিছু হটছে।

পলায়নপর পাকবাহিনি আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হল। টাঙ্গাইল মুক্ত হবার পর মিত্র ও মুক্তিবাহিনি চলল ঢাকা শহরের দিকে। পাকবাহিনি তখনও যুদ্ধ করতে প্রস্তুত। শুরু হল বিমান থেকে রাজধানী ঢাকায় বোমা ফেলা। চারদিক কামানের গর্জনে প্রকম্পিত। লক্ষ্য এবার রাজধানী ঢাকা।

তেরোই ডিসেম্বর বিকেলের রোদ সবে পড়তে শুরু করেছে। বাহিনি টঙ্গীতে। রাতটা এখানেই কাটাতে হবে। পরদিন তুরাগ নদী অতিক্রম করে ঢাকা মুক্ত করার অভিযান চলবে। যুদ্ধজয়ের আনন্দ ইতোমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। মানুষ যেভাবে ভারতীয় বাহিনিকে বরণ করেছে তাতে অর্জুনরা অভিভূত। হঠাৎ অর্জুনের মনে হল, টঙ্গী বাজারের কথাইতো বলেছিল আনোয়ার। বন্ধুর বাড়িটি দেখে গেলে কেমন হয়? ছেলেটির বয়সতো ওর ছেলের মতই। অর্জুনের মন মোচড় দিয়ে ওঠে।

একটু খোঁজখবর করতেই অর্জুনের মনে হল, আনোয়ার এখানে বেশ পরিচিত এক ব্যক্তিত্ব। 'আনোয়ার স্যার' বলতে একবাক্যে সবাই তাকে চেনে। কিন্তু বাড়ি দেখিয়ে দিতে সবাই কুণ্ঠিত হচ্ছে কেন? কেউ বাড়ির অবস্থা সম্পর্কে কিছুই বলতে চাইছে না কেন? বাড়ির কথা জিজ্ঞেস করতে সকলের মুখই এমন অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে কেন?

অর্জুন সবশেষে জানতে পারল, আনোয়ারের বাড়ি পাকসেনারা পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে। দালালরা জায়গাটি দখল করে নিয়ে শান্তিবাহিনির ক্যাম্প বানিয়েছে। কিন্তু আনোয়ারের স্ত্রী-পুত্র গেল কোথায়? কেউ বলতে পারছে না। হতাশ হয়ে অর্জুন ক্যাম্পে ফিরে এল।

সবে সন্ধ্যা হয়েছে। চারদিক আনন্দ উৎসবে মাতোয়ারা। স্লোগানের শব্দে কান ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছে। ক্ষণে ক্ষণে ফাঁকা গুলির আওয়াজ। দূর থেকে কামানের গোলার শব্দ ভেসে আসছে। কিন্তু অর্জুন সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন। মনটা বিষাদে পূর্ণ। ক্ষণে ক্ষণেই তার মনে হচ্ছে, আনোয়ারের স্ত্রী-পুত্রের কোন বিপদ হল না তো! এমন সব অলক্ষুণে কথা কেবলই তার মনে জাগছে। এক সময় সে খবর পেল, বাইরে এক বৃদ্ধ তাকে খুঁজছে। কে তাকে খুঁজবে? বিস্মিত অর্জুন! তবে কি বন্ধুর স্ত্রী-পুত্রের খোঁজ পাওয়া

গেছে?

আধো অন্ধকারেও বৃদ্ধের মুখটা দেখা যাচ্ছে। সাদা দাড়ি। মাথায় সাদা টুপি। গায়ের রঙ ফর্সা। বেশ বেঁটে। বৃদ্ধ কাচুমাচু ভাব করে দাঁড়িয়ে আছে কেন? অস্বস্তিতে কথা বলতে পারছে না। মুখ মলিন।

'আনোয়ার স্যার আমার বাড়ির পাশে থাকতেন। তার মত লোক হয় না। আমরা জানি, তিনি মুক্তিযোদ্ধা। আপনি তাকে কিভাবে চেনেন? তিনি ভাল আছেন তো?' এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে বৃদ্ধ হাঁপাতে লাগল।

'আনোয়ার ভাল আছে। যুদ্ধ শেষ হলেই ফিরে আসবেন। আপনি কেন এসেছেন? আপনি কি ওর স্ত্রী-পুত্রের খবর জানেন।' অর্জুনের মনে হল বৃদ্ধ হয়তো কিছু জানেন। জিজ্ঞাস দৃষ্টি তার। বৃদ্ধ কাঁদছে। শরীরটা তার কেঁপে কেঁপে উঠছে। চোখের পানি হাত দিয়ে মুছল। টুপিটা নামিয়ে মুখটা আড়াল করে বৃদ্ধ বলল, আনোয়ার স্যারের ছেলে আছে আমার মেয়ের বাড়িতে। এখান থেকে তিন মাইল দূরে। আমার মেয়ে স্যারের ছাত্রী ছিল। ওর একই বয়সের এক মেয়ে আছে। ও দু'জনকে জমজ শিশুর মত পালছে। ছেলেটি ভাল আছে।'

এতটুকু বলে বৃদ্ধ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। অর্জুন নিজেকে সামলাতে না পেরে ধমক দিয়ে উঠল, 'ছেলের মা কোথায়? আনোয়ারের স্ত্রী? সবটা বলুন।'

বৃদ্ধ যা বললো, তা অর্জুনের কল্পনারও বাইরে। এমন ঘটনা কি ঘটতে পারে? পাকিস্তানি বাহিনির অফিসাররা এতটা নিচে নামতে পারে? ক্ষোভে-দুঃখে অর্জুন সিংয়ের মুখটা রক্তিম হয়ে ওঠে। রোজিনা পুত্রসহ এ বাড়ি থেকে ও বাড়ি পালিয়ে বেড়াচ্ছিল। কয়েকদিন আগে কিছু হবে না ভেবে বাড়ি যায়। ছেলের জন্য বাপের কিনে দেওয়া খেলনাগুলো আনতে। এতেই হয়েছে কাল। দালালরা পাক আর্মিদের খবর দেয়। খাসা জেনানা পাওয়া গেছে। সদলবলে ওরা এসে বাড়ি ঘেরাও করে। আগুন ধরিয়ে দেয়।

রোজিনা শিশুপুত্রকে কোলে নিয়ে প্রাণভয়ে বাইরে আসে। কিন্তু আগুনের চাইতে বড় বিপদ বাইরে অপেক্ষা করেছিল। হানাদার বাহিনির অফিসাররা ওকে আটক করে। মায়ের কোল থেকে ছেলেকে ছিনিয়ে নিয়ে ঝোঁপের মধ্যে ফেলে দেয়। তারপর রোজিনাকে জিপে ওঠায়। আগুনের আলোতে বৃদ্ধ দূর থেকে সব দেখছিল। জিপের শব্দ, ছেলের কান্না, মায়ের চিৎকার একাকার। এলাকার পরিবেশ ভয়ার্ত শংকিত। নিরীহ নিরস্ত্র মানুষ। কারো পক্ষেই এগিয়ে আসা সম্ভব ছিল না। ওরা চলে গেলে ক্রন্দনরত শিশুকে বৃদ্ধ ঝোঁপ থেকে তুলে নেয়।

বৃদ্ধ অতি মৃদু স্বরে বলতে থাকে, 'শুনেছি রোজিনা আম্মাকে ওরা স্কুলের হেড মাস্টারের পরিত্যক্ত বাসায় নিয়ে গেছে। ওখানেই ওরা মেয়েদের নিয়ে যেত। রাতে মদ-মাংস খেয়ে ফূর্তি করার জায়গা ওটা। পাক আর্মি ও দালালরা এখন সেখানে নেই। শুনেছি কতক মেয়ে ওখানে বন্দী অবস্থায় আছে। রোজিনা আম্মা হয়তো ওখানে বেঁচে থাকতে পারেন। আপনি যদি মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে নেন, তবে আমি পথ চিনিয়ে নিতে পারি। শুনেছি, ওখানে যাবার বিপদ এখনও আছে।'

বৃদ্ধের কথা শোনার পর অর্জুন সিংয়ের পক্ষে ধৈর্য ধারণ অসম্ভব হয়ে ওঠে। মুহূর্তের মধ্যে অর্জুন একটা সশস্ত্র বাহিনিকে গুছিয়ে নেয়। গন্তব্য তাদের হেড মাস্টারের বাসার দিকে।

চার.

এখন রাত আটটার মত হবে। গ্রামের রাস্তা। স্লোগানের শব্দ এখানে নেই। তবে কামানের গোলার শব্দ ভেসে আসছে। ঘন কুয়াশা চারদিকে। অন্ধকারে পথ। বৃদ্ধ পথ দেখিয়ে ওই দলটিকে হেড মাস্টারের বাসার সামনে নিয়ে এলো।

এদিক-ওদিক বাংকার পরিত্যাক্ত অবস্থায় রয়েছে। চারদিক অপরিষ্কার। দুর্গন্ধে টেকা দায়। বাসনপত্র, সিগারেট, দিয়াশলাইয়ের খালি খোসা, পোড়া সিগরেট আর মাংসের কিছু হাড্ডি এদিক-ওদিক ছড়ানো। অর্জুন সিং হাঁক দিয়ে দলের সকলকে যথাযথ স্থানে অবস্থান নেওয়ার নির্দেশ দিলেন। তারপর চলল ক্ষণে ক্ষণে ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার। কিন্তু বাড়ির ভিতরে কেউ আছে বলে মনে হল না।

অর্জুন সিং বৃদ্ধসহ কয়েকজনকে নিয়ে বাড়ির ভিতরে প্রবেশের চেষ্টা করল। সদর দরজায় তালা নেই। ধাক্কা দিতেই খুলে গেল। নিচের ঘরগুলো খোলা। তবে জনশূন্য। দলটি সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠল। সব দরজায় তালা। কান পাতা হলে ভিতর থেকে ভেসে এল মহিলাদের মৃদু ক্রন্দনের সুর।

তালা ভাঙা হলে অর্জুনই প্রথমে ঘরে ঢুকল। ঘর অন্ধকার। টর্চ জ্বালাতেই অর্জুন দু'পা পিছিয়ে বের হয়ে এল। উলঙ্গ, অর্ধ-উলঙ্গ বিভিন্ন বয়সের মেয়েরা সেখানে। অর্জুন যা দেখল, তা কোনদিন কল্পনা করতে পারেনি। শিহরীত হয়ে উঠল। এর মধ্যে কি বন্ধুপত্নী রয়েছেন? অর্জুন তাকে কি বলে প্রবোধ দেবে? কিভাবে নিজেকে পরিচয় করাবে? এসব ভাবতে ভাবতেই অর্জুন বৃদ্ধকে বলল, 'বেশ কিছু শাড়ি যোগাড় করতে হবে।'

হেড মাস্টারের বাড়িতে একটা ঘরে কাপড় পাওয়া গেল। বেশ কতক লণ্ঠনও ছিল। ওগুলো জ্বালাতে একটুও দেরি হল না। কাপড়গুলো ঘরে ছুঁড়ে দিলে ওতে মেয়েরা হুমড়ি খেয়ে পড়ে। বেশ কতক্ষণ পর অর্জুন বৃদ্ধসহ ঘরে ঢুকল। কাউকে চেনা যাচ্ছে না। সকলের মুখ আঁচলে ঢাকা। কেউ কাঁদছে, কেউ-বা কাঁপছে। কারো মুখে কোন কথা নেই।

বৃদ্ধ তখন বলে উঠল, 'আনোয়ার স্যারের স্ত্রী রোজিনা আম্মা কি এখানে আছেন? মুখ তুললে আমি চিনতে পারব। ছেলে ভাল আছে, আমার মেয়ের বাড়িতে।' একটু দম নিয়ে অর্জুনের দিকে তাকিয়ে বৃদ্ধটি বললেন, 'ইনি ভারতীয় মেজর, আনোয়ার স্যারের বন্ধু। স্যার ময়মনসিংহে রয়েছেন।' কথা সম্পূর্ণ শেষ হল না। একজন নির্যাতিতা অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। বৃদ্ধ প্রায় চিৎকার করে বলল, 'এইতো রোজিনা আম্মা আমার।'

তখনও ভোর হয়নি। কনকনে শীত। টুপটাপ শিশির পড়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে। আজানের সুমধুর ধ্বনি অদূরের মসজিদ থেকে ভেসে আসছে। যৌথবাহিনি প্রস্তুত। তুরাগ নদী পার হয়ে ঢাকা অভিমুখে দ্রুত অগ্রসর হতে হবে। শত্রুপক্ষ পুল ভেঙে দিয়েছে। নদীর ওপার দখল করা নিয়ে সম্মুখ যুদ্ধ হবে। তাই সাজ সাজ রব।

অর্জুন সিং বাইরে এসে দাঁড়ালেন। যুদ্ধে যাবার জন্যে তিনি প্রস্তুত। চারদিক ঘন কুয়াশায় ঢাকা। একটু দূরের আলোও দেখা যাচ্ছে না। বাহিনি এখন তুরাগের দিকে অগ্রসর হবে। গত রাতে বৃদ্ধের বাড়িতে বন্ধুপত্নী রোজিনাকে তুলে দিয়ে অর্জুন ক্যাম্পে ফিরেছিল। একটা কথাও রোজিনা বলেনি।

অর্জুনের নিশ্চুপ না থেকে উপায় ছিল না। প্রবোধ দেওয়ার মত কোন বাক্য অর্জুন খুঁজে পায়নি। এসব ভাবনার সময় অবশ্য এখন নয়। সামনে যুদ্ধ। কিন্তু মন! চিন্তার ব্যাপকতা ও গতিকে কী কেউ কখনও রুদ্ধ করতে পারে?

প্রহরীকে এ সময় আসতে দেখে অর্জুন অবাক। বৃদ্ধ তার সঙ্গে এসেছেন। অর্জুন দ্রুততার সঙ্গে বৃদ্ধের সামনে এসে দাঁড়াল। ব্যাপার কি? কোন দুর্ঘটনা নয় তো? গভীর রাতে রোজিনা গলায় ফাঁসি দিয়ে মরেছে। বৃদ্ধের স্ত্রী সাথে ঘুমিয়েছিল। কিন্তু টের পায়নি। যুদ্ধে যাবার মুহূর্তে এ রকম একটা হৃদয়বিদারক মৃত্যুর খবর শোনার জন্য অর্জুন প্রস্তুত ছিল না।

কিন্তু সে ভাবল, রোজিনার আর কিই-বা করার ছিল। আনোয়ারের সামনে সে দাঁড়াতো কিভাবে কলংকের বোঝা নিয়ে? কিন্তু এ কি কলংক? রোজিনা তো নিরপরাধ। একে লোকসমাজ কি বলবে? রোজিনাকে নষ্ট মেয়ে মানুষ বলবে কি? সব শুনে কিভাবেই-বা আনোয়ার রোজিনাকে গ্রহণ করবে? প্রথম দর্শনেই যদি কোন অঘটন ঘটে? যদি আজীবন কেবল কথার মধ্যে রোজিনাকে থাকতে হয়? অর্জুন আর ভাবতে পারে না। যুদ্ধে যেতে হচ্ছে। এখন এত সব ভাবাটা ঠিকও নয়।

প্রতিরোধ তেমন নেই। তুরাগের অপর পারে যৌথবাহিনি পৌঁছে গেছে। এখন বাহিনি তীর দখল নিবে। মাঝে মাঝে দু'একটা ওদিক-এদিক গুলি যে আসছে না এমন নয়। অর্জুন সকলকে সাবধানে অগ্রসর হতে নির্দেশ দিল। কিন্তু অর্জুন সাবধান হতে পারছে কই? মাঝে মাঝেই সে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছে। ভেসে উঠছে আনোয়ারের হাস্যোজ্জ্বল মুখ। রোজিনা কী সুন্দরীই না ছিল? আনোয়ার সহ্য করতে পারবে কি? ছেলেটারই-বা কি হবে? পাঞ্জাবে স্ত্রী-পুত্র কেমন আছে? অমঙ্গল আশংকায় বুক কেঁপে ওঠে অর্জুনের। একেবারেই ভুলে গেল সে যুদ্ধক্ষেত্রে রয়েছে।

ঠিক এই সময় ঝাঁকে ঝাঁকে গুলির শব্দ। অর্জুন সম্বিত ফিরে পাবার আগেই ওর বুকটা ঝাঁজরা হয়ে গেল। রক্তাক্ত দেহ তুরাগের ঢালু পাড়ে

লুটিয়ে পড়ল।

শত্রু পিছু হটে গেছে। যুদ্ধ বলতে যা বোঝায় তা হল না। ঘন কুয়াশার মাঝেও দেখা যায় পুবদিক ক্রমে লাল হয়ে উঠছে। পাখির কলকাকলি বাড়ছে। মুক্তি ও মিত্রবাহিনি জোর কদমে ঢাকার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। মুক্তাঞ্চল কেবলই বাড়ছে। প্রাণচাঞ্চল্যের ছোঁয়া চারদিকে। কিন্তু অর্জুনের দেহ প্রাণ স্পন্দনহীন। দেহের সবটুকু রক্ত বাংলার মাটিতে নিঃসৃত হয়ে গেছে। রক্তের স্রোত তুরাগের ঢাল বেয়ে নামছে। এক সময় তা মিশে গেল তুরাগের পানিতে।

পাঁচ.

ময়মনসিংহে থাকতেই আনোয়ার জানতে পারল, রোজিনা আর নেই। এমন এক করুণ পরিণতির জন্য সে একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। বিজয়ের আনন্দ সে নিতে পারছে না। কোন সময় সে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে নীরবে বসে থাকে। কখনও মনে জ্বলে প্রতিশোধের আগুন। একটি পাক সৈন্যকেও সে খতম করতে পারিনি। পারেনি ঘাতক কোন দালালকে খতম করতে। আইনশৃঙ্খলার দায়িত্ব তার। কিভাবে সে দালাল মারতে পারে? ক্ষোভে দুঃখে সে ভেঙে পড়েছে। হানাদার বাহিনির যুদ্ধবন্দীরা তো শাস্তি পাবে? রাজাকার-আলবদর-আলশামসদের নিশ্চয়ই বিচার হবে। অপরাধের শাস্তি না পেয়ে কেউ কি থাকতে পারে?

আনোয়ার ঢাকা এসেছে। স্বাধীন দেশে বঙ্গবন্ধুর কাছে অস্ত্র জমা দিয়েছে। ব্যক্তিগত সব স্বপ্ন তার চূর্ণ হয়ে গেছে। রোজিনা ছাড়া কি সে একা স্বপ্ন দেখতে পারবে? না, সে পারবে না। কিন্তু তার চিরদিনের স্বপ্ন। যদি দেশের উন্নতি হয়, মানুষের দুঃখ-দুর্দশা ঘোচে, তবে আনোয়ার শান্তি পাবে। আত্মত্যাগ তো কারো না কারো করতেই হয়, এই ভেবে সে মনকে প্রবোধ দেয়। কিন্তু বাঁধভাঙা জোয়ারের মত চোখে জল আসে। বুক যেন তার যুদ্ধক্ষেত্র। সেখানে অনবরত গ্রেনেড ফেটে চলছে।

আনোয়ার এখনও ছেলের খোঁজ নেয়নি। ছেলে কোথায় আছে শুনেছে। রোজিনার একমাত্র স্মৃতি ছেলে। কিন্তু তাকে নিয়ে সে কি করবে? কাছে রেখে কি মানুষ করতে পারবে? না, দুগ্ধপোষ্য শিশুকে সে লালন পালন করতে পারবে না। ছেলে নিরাপদে ভালই আছে। ওখানেই ওকে রাখবে। অধ্যাপনা করার আর কোন ইচ্ছাই তার নেই। সে কলেজে যোগ দেবে না। হাতে কোন কাজও এখন তার নেই।

অস্ত্র জমা দেবার পর সে তার ভারতীয় বন্ধু অর্জুনের খোঁজ নেবে বলে মনস্থ করেছিল। স্টেডিয়াম থেকেই জানতে পারে মিত্রবাহিনি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করবে। তাই দেরি না করে সে বন্ধুর খোঁজে নামে। কিন্তু কাজটা খুব একটা সহজ নয়। সারাদিন ঘুরে ফিরে পড়ন্ত বিকেলে সে জানতে পারল, তার বিদেশি বন্ধুটি তুরাগের তীরে শত্রুর বুলেটে জীবন দিয়েছে। রোজিনাকে সে নরক থেকে তুলে এনেছিল। একটুও ঘৃণা করেনি। সমাজে স্থান করে দিয়েছিল। বন্ধুটি কত না তার আপন! স্ত্রী নেই, বন্ধুও নেই। সে একা, নিঃসঙ্গ। এ থেকে উদ্ধারের পথ কি? আনোয়ার কিছুই ভাবতে পারে না।

আনোয়ারকে এবার টঙ্গী যেতেই হল। তুরাগের পাড়ে বন্ধুটি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে। স্থানটিকে তার চিহ্নিত করতেই হবে। ওখানে পাকিস্তানিদের গুলিতে একজন মাত্র মারা গেছে। সেই একজন অর্জুন হল কিভাবে? সুদক্ষ যোদ্ধা সে। গুলিবিদ্ধ হল কিভাবে? আনোয়ার উত্তর খুঁজে পায় না। রোজিনার আত্মহত্যার করুণ কাহিনি চিন্তা করে যে অর্জুন তখন অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল, তা আনোয়ার জানতে পারেনি। যদি জানতে পারত তবে তার কি প্রতিক্রিয়া হত? আনোয়ার কি পাগল, বদ্ধ পাগল হয়ে যেত না?

টঙ্গীতে আনোয়ার স্যারকে বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে সংবর্ধনা দেওয়া হল। দুঃখ ভারাক্রান্ত আনোয়ারের বক্তৃতা দেবার ইচ্ছে একেবারেই ছিল না। কিন্তু উপস্থিত সকলের অনুরোধ, কিছু বলতেই হবে। বক্তৃতায় আনোয়ার সকল শহীদের সাথে রোজিনা আর অর্জুনের স্মৃতিও স্মরণ করল।

পাঞ্জাবিদের প্রতি তীব্র ঘৃণা বিদ্বেষ জনগণ পোষণ করে, এটা আনোয়ার জানে। তাই সে বাংলার মত পাঞ্জাব ভাগের ইতিহাস তুলে ধরে বলল, 'ইতিহাসের এ এক নির্মম পরিহাস! পাকিস্তান অংশের পাঞ্জাবি সৈন্যরা হানাদার বাহিনির সদস্য হিসেবে আমাদের দখল করে রেখেছিল। রোজিনাকেও নরকে নিয়েছিল পাঞ্জাবি এক মেজর। আর রোজিনাকে মুক্ত করেছে ভারতের অংশ পূর্ব পাঞ্জাবের অধিবাসী মেজর অর্জুন সিং। পরিবেশই মানুষকে পশু করে তোলে। আমাদের দেশের মহান স্বাধীনতা আনার জন্যে মেজর অর্জুন রক্ত বিলিয়ে দিয়েছে। নিজের দেশের স্বাধীনতার জন্যে রক্ত দেবার ইতিহাস আছে ভুরিভুরি, কিন্তু অপর দেশের স্বাধীনতার জন্য আত্মত্যাগ খুব একটা সহজ কাজ নয়। অর্জুনের মত মিত্রবাহিনির শহিদরা অমর। আমরা ওর স্মৃতিতে তুরাগের তীরে স্মৃতি মিনার নির্মাণ করব। যতদিন তুরাগ থাকবে, ততদিনই থাকবে অর্জুনের স্মৃতি। সভায় ঘোষিত হল বীরাঙ্গনা রোজিনার স্মৃতি অম্লান করে রাখার জন্যে এলাকায় একটি মহিলা কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হবে।

সভা শেষ হতেই সেই বৃদ্ধ এসে দাঁড়ালেন আনোয়ারের সামনে। আনোয়ার জানে, বৃদ্ধ বাঁচাতে চেয়েছিল রোজিনাকে। তার মেয়ের কাছেই আছে তার একমাত্র স্মৃতি। আনোয়ারের ছাত্রী এখন ওই শিশুর মায়ের ভূমিকা নিয়েছে। নিজের সন্তানের সঙ্গে একই স্নেহ-মমতায় তাকে মানুষ করছে।

'স্যার, যাবেন না দেখতে দাদুকে। ঠিক আপনার মত হয়েছে দেখতে। দাঁড়াতে চায়, পারে না। বা-বা উচ্চারণও করতে পারে। এখনই চলেন।' বৃদ্ধের চোখে পানি। তিনি আনোয়ারের হাত ধরলেন। আনোয়ার তার দুঃখ ভারাক্রান্ত মাথাটা বৃদ্ধের বুকে সঁপে দিল। চারদিকে মানুষ ওদের ঘিরে ধরছে। সবারই চোখে অশ্রু। শীতের বিকাল। দ্রুতই সন্ধ্যার আঁধার চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

মেঠো পথ। এদিক ওদিক ছোট বড় খানাখন্দ। অতি সন্তর্পণে হাঁটতে হয়। আনোয়ারের কোন অসুবিধা হয় না। অন্ধকারেও দেখতে হবে, এটাও তো ট্রেনিং-এরই অংশ ছিল। পাশে বৃদ্ধ হাঁটছে। এই পথে আনোয়ার কতই না হেঁটেছে। কিন্তু সবটাই কেমন যেন আপন, নিজের মনে হয়। আনোয়ার ভাবে, স্বাধীন দেশের পথও কী অন্য রকম? অনুভূতি এমন লাগে কেন?

পথটা যেমন উঁচু নিচু আনোয়ারের মনটাও এখন ঠিক তেমনি। স্বাধীন দেশ ভাবলেই মনটাতে সুখানুভূতি জাগে, পরক্ষণেই আবার স্ত্রী ও বন্ধু বিয়োগে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। হাঁটতে হাঁটতেই আনোয়ার করুণ সুরে বলে, 'রোজিনার ছেলেকে বড় করে তোলার ক্ষমতা আমার নেই। আর ওর পরিচিত পরিবেশ থেকে ওকে তুলে আনা ঠিক হবে না। ও কি ওখানেই থাকতে পারে না?' বৃদ্ধ নিরুত্তর।

এক সময় দু'জন যথাস্থানে পৌঁছল। ছেলেটি তখন ঘুমাচ্ছে। আনোয়ার নিষ্পলক দৃষ্টিতে ছেলের দিকে তাকিয়ে থাকে। ছাত্রী বলে, 'স্যার, ঠিক আপনার মত দেখতে হয়েছে।' আনোয়ার হাসতে চাইছে, কিন্তু বুকে তার পাথর। কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর আনোয়ার বলে, 'ও কিন্তু তোমার কাছে থাকবে। ওকে মানুষ করে তোলার দায়িত্ব তোমার। ওকে তোমার কাছে রেখে আমি ভারমুক্ত।'

ছয়.

পরদিনই আনোয়ার ঢাকা ফিরে এসেছে। এমন নিঃসঙ্গতায় সে আগে আর কখনও ভুগেনি। কিছু করতে ইচ্ছে হয় না। কিন্তু বসে থাকতে ভালও লাগে না। দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনি গড়ে তোলার কথা সরকারের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়েছে। আনোয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, সে সেনাবাহিনিতে যোগ দেবে। মুক্তিযুদ্ধের সময়কার সেনাজীবনের স্মৃতি সে স্মরণ করে। সেখানকার নিয়মমাফিক সংঘবদ্ধ জীবনে একাকীত্ব তেমন থাকবে না বলেই মনে করে।

নিয়োগপত্র পেয়ে গেছে আনোয়ার। হাতে আছে এক মাসেরও কিছু বেশি সময়। তারপর থেকে সে হবে আর্মি অফিসার। সময় যেন কাটে না। হঠাৎই মনে হল অমৃতসর গেলে কেমন হয়? বন্ধু অর্জুনের স্ত্রী-পুত্রকে দেখে আসা তার কর্তব্য। আনোয়ার ভাবে আমাদের দেশের স্বাধীনতার জন্যে সে জীবন দিয়েছে। ভিন দেশের এক স্ত্রী তার স্বামীকে হারিয়েছে, পুত্র পিতাকে। সাক্ষাৎ করে কৃতজ্ঞতা জানানো উচিত বৈ কি!

পাঞ্জাবের রাজধানী চণ্ডীগড়ে আনোয়ার একাকী ঘুরে বেড়াচ্ছে। বসন্তের মনোরম বাতাসে শীতের প্রলেপ। শরীর জুড়িয়ে যায়। পরিকল্পিত শহর। রাস্তার পাশে পাশে ফুলের সমারোহ। নানা বর্ণের ফুল রাঙিয়ে তুলছে শহরকে। চোখে নেমে আসে প্রশান্তি। যাদের সঙ্গে দেখা হয়, তারাই

বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে আনোয়ারকে সমাদর করে। মুক্তিযুদ্ধ আর তার নেতা শেখ মুজিব সম্পর্কে জানতে চায়। প্রবাসে এমন মর্যাদা সত্যিই দুর্লভ। সব মিলিয়ে তার মন এখন অনেকটাই হালকা।

অমৃতসরে পৌঁছে স্বর্ণমন্দির দেখে আনোয়ার বিস্মিত। গম্বুজটা উল্টো পদ্ম। সূর্যের আলোতে ঝলমল করছে। মন্দিরের দেয়ালে হিন্দু ও মুসলিম স্থাপত্যের সম্মিলন, ফুল ও জীবজন্তু অঙ্কিত। অমৃতসর থেকে পাকসীমান্ত ২৫ কিলোমিটারের দূরত্ব। ডালু বাজারের স্মৃতি আনোয়ারের স্মরণে আসে। ওখানেই অর্জুনের সঙ্গে তার প্রথম পরিচয় হয়েছিল। ডালু বাজার থেকে পাকসীমান্ত কতদূর ছিল? মনে করতে পারে না সে। তবে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। এখনতো আর পাকসীমান্ত নেই। বাংলাদেশ সীমান্ত। সূর্য ঢলে পড়েছে। স্বচ্ছ সুন্দর আকাশ। চারদিক নির্মল পবিত্র। আনোয়ার বন্ধুর বাড়ির দিকে অগ্রসর হচ্ছে। বুক তার কম্পমান। বন্ধুপত্নীর সঙ্গে কি তার দেখা হবে? শিশু পুত্রটিকে কি কোলে তুলে নিতে পারবে? কিভাবে প্রবোধ দেবে সকলকে? নিজের কথা কি বলবে? আনোয়ার ক্ষত-বিক্ষত হতে থাকে।

দুর্গিয়ানা মন্দিরে আরতির ঘণ্টা বাজছে। পাঞ্জাব আর বাংলার তফাত কিছু আছে কি? ঘণ্টার শব্দ পৃথক করা দুঃসাধ্য। আনোয়ার অর্জুনের বাড়িতে পৌঁছে নিজের পরিচয় দেয়। আনোয়ার অবাক; বিধবা স্ত্রী আর বৃদ্ধ বাবা দু'জনের কাছেই আনোয়ার নামটি পরিচিত। ছেলের মতই তাকে সস্নেহে বরণ করা হয়। কান্নায় আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে ওঠে। মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে তা একাকার হয়ে যায়। আনোয়ার সব ঘটনা তুলে ধরে। আনোয়ারের কথা শেষ হলে অর্জুনপত্নী উঠে যায়। একটা ডাইরি এনে দেয়। রক্তের মত লাল মলাট। আনোয়ার ওটা চেনে। সে শেষ পাতাটা খুঁজে নেয়। এক নিঃশ্বাসে পড়ে। সব শেষে অর্জুন লিখেছে, 'রাতে ঘুমাতে পারিনি। কেবলই ভেবেছি আনোয়ারের স্ত্রী রোজিনার কথা। আনোয়ার কি ওকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারবে? যুদ্ধ শেষ হলে আমি এখানে আবার আসব। রোজিনার কোন দোষ নেই। সে নির্মল, পবিত্র। যদি আনোয়ার তাকে ভুল বোঝে? রাত শেষ হয়ে আসছে। প্রস্তুত হতে হবে। যুদ্ধ এখনও অনেক বাকি। কাল কি রাজধানী ঢাকা পৌঁছতে পারব?'

ডাইরির লেখা এখানেই শেষ হতে হয়তো-বা পারত। কিন্তু শেষ হয়নি। পরের দিনের তারিখ। ভোর রাত শব্দটি সংযোজিত হয়েছে। অর্জুন লিখেছে, 'অলুক্ষণে খবর পেলাম। ওহি গুরু! বৃদ্ধ কি কোন ভুল খবর দিল? না, মেয়ের মত স্নেহ করে রোজিনাকে। রোজিনা গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করল কেন? একটু অপেক্ষাও কি করতে পারত না? কিন্তু ইজ্জত হারিয়ে স্বামীর সামনে দাঁড়ানোটা কি খুব সহজ? আনোয়ারকে সে মুখই দেখাত কিভাবে? কিভাবে দাঁড়াত প্রিয়তমের সামনে? কিছুই ভাবতে পারছি না আমি। মাথা আমার গুলিয়ে গেছে। শরীর কাঁপছে। এ অবস্থায় কি যুদ্ধে যাওয়া যায়?'

আনোয়ার বুঝতে পারে যুদ্ধের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিল না অর্জুন। অন্যমনস্ক না থাকলে অর্জুনের বুকে গুলি লাগত না। এ বিষয়ে আনোয়ার নিশ্চিত। আনোয়ারের জন্যেই অর্জুনের মৃত্যু হয়েছে। আনোয়ার মনে মনে বলে, 'হে আল্লাহ! দুঃখের এ বোঝা বইব কিভাবে?' অর্জুনের পত্নী আনোয়ারকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। আনোয়ারের কোলে অর্জুনের শিশু। নতুন জীবনের স্পন্দন তার শরীরে। আনোয়ার এখন শান্ত।

'বন্ধু যেখানে রক্ত দিয়েছে ঠিক সেখানে নির্মিত হবে স্মৃতিসৌধ। তুরাগ পারের পবিত্র স্থানটিতে জ্বলজ্বল করে চিরকাল লেখা থাকবে অর্জুনের নাম। ভাবি তুমি কি যাবে স্থানটি দেখতে? এবারই তুমি চল আমার সাথে। দেখে আসবে বন্ধুর শেষ নিঃশ্বাস ফেলার জায়গাটা। যেখানে মাটি আর নদীর স্রোতের সাথে বন্ধুর রক্ত মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।' আনোয়ার মিনতির সুরে ভাবির দিকে তাকায়।

'এবারে যাব না। ছেলেটা বড় হোক। তোমার ছেলেও বড় হবে। একজন মা আর আরেকজন বাপ হারিয়েছে। দু'জনে মিলে দেখবে জায়গাটা। আমাকেও দেখতে হবে দু'চোখ ভরে। অশ্রু দিয়ে সিক্ত করে দিতে হবে স্মৃতিচিহ্নটি। যদি স্থানটা না দেখি তবে অপূর্ণ রয়ে যাবে ব্যথার পূজা।' চোখের জলে ভিজে কথাগুলো বসন্তের স্নিগ্ধ বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল। বৃদ্ধ পিতার চোখেও অশ্রু থামে না। তুরাগের স্রোত আর পঞ্চ নদীর স্রোত তো একাভিমুখী। সমুদ্রের দিকেই তার গতি। ছেলেটা এখন বিছানায় ঘুমিয়ে পড়েছে। দেখতে কী নিজের ছেলের মতই নয়!

সাত.

আনোয়ারের ছেলের ডাকনাম জয়। সে ডাক্তারি পাস করেছে। ইতোমধ্যে পালিতা মার কাছে শুনেছে মুক্তিযুদ্ধের সময় ইজ্জত দিয়েছে তার মা। স্বহস্তে ফাঁসির দড়িতে জীবনকে শেষ করেছে। আর বাবাকে পঁচাত্তরের পর ফাঁসির দড়িতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়েছে। কোন বিচার হয়নি। জয়ের বয়স তখন ছয় বছরের মত। অভিযোগ, মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে বাবা নাকি আর্মিতে বিদ্রোহ করেছিলেন। কোন প্রমাণ ছিল না। বাবার ছাত্রী তার পালিত মা। পালিত মাকে সে মা বলে ডাকে। আদরেই মানুষ হয়েছে। সে ছাত্র ভাল ছিল। কিন্তু জীবন বৃত্তান্ত স্মরণে এলে বুকটা তার ক্ষতবিক্ষত হয়, জ্বলে ওঠে।

চাকরি নিয়ে এবারে তাকে গ্রামে যেতে হবে। মাকে দেখতে সে এসেছে। আজ বিজয় দিবস। ছাব্বিশ বছর পূর্ণ হয়েছে। পরদিন সে কর্মস্থলে চলে যাবে। রাতে মা একটা স্যুটকেস এনে ওর সামনে রাখে। জয় অবাক। মা বলেন, 'এটা তোর বাবার। সাথে রাখিস। ওতে একটা ডাইরি আছে। পড়বি। মুক্তিযুদ্ধের পরদিন থেকে তোর বাবার গ্রেফতার হবার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত ওতে সবকিছু লেখা আছে।'

জয় ডাইরিটা পড়ে। বার বার পড়ে। স্বপ্ন খান খান হয়ে ভেঙে পড়ার এক করুণ কাহিনি। সে কখনও রাজনীতি করেনি। জয় ভেবে উঠতে পারে না কি তার করা উচিত। বাবার কোন সাধই পূরণ হয়নি। আর মেজর অর্জুন সিং! মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হয়েছিল। মাকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন। পারেননি। বাবা লিখেছেন, 'পারিনি তুরাগের পারে স্মৃতিসৌধ গড়তে। ভাবিকে কথা দিয়ে এসেছিলাম। স্মৃতিচিহ্ন দেখাব। কিন্তু কি করা? জীবনে কী আর সুযোগ পাব স্মৃতিসৌধ গড়ার। পাব না। ভাবিদের কী এদেশে আনতে পারব? পারব না। ওদের মুখ দেখাব কেমন করে? কোন চিহ্নই তো নেই তুরাগের পারে। কিছুই করতে পারলাম না। এখন আর ভাবিদের সাথে যোগাযোগ রাখি না। লজ্জায় ওদের মুখ দেখাতে পারব না। এর চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয়! অর্জুনের ছেলেটি এখন সব বোঝে। ঠিক যেমনটা বোঝে জয়। আমি যে বাবা, জয়কে বলা হয়নি। ওতো জন্ম-পরিচয় জানবেই না। দেশটা এমন হবে তাতো ভাবতেই পারিনি। সব স্বপ্ন আমার ভেঙে চুরমার। ফাঁসির সময় ঘনিয়ে আসছে। মৃত্যুর পর তো সবই অন্ধকার।'

এ ধরনের কথার পুনরাবৃত্তি ডাইরিতে অনেক রয়েছে। ঘুরে ফিরে একই কথা, স্বপ্নভঙ্গের। জয় ভাবে 'একবার অমৃতসর যেতে হবে। ওরা বেঁচে আছে? ওদের কি পাওয়া যাবে? খুঁজে বের করতেই হবে ওদের। বাবার ডাইরিটা ওদের পড়াতেই হবে। বাবার ডাইরিতে অর্জুন চাচার ডাইরির কথা লেখা রয়েছে। দুটো যদি একত্র করা যায় তবে কী একটি স্বাধীন দেশের চেতনার উত্থান আর সেই সাথে পতনের কাহিনি একত্রে পাওয়া যাবে না? অবশ্যই যাবে। দেশের ইতিহাস আর জীবনের ইতিহাস। এ দুই ইতিহাস কি এক ও আবিভাজ্য নয়!'

আট.

দুই ছেলে এসেছে দুর্গিয়ানা মন্দিরে। সঙ্গে রয়েছে মা। অর্জুনের স্ত্রী আনোয়ারের প্রিয়তম বন্ধুপত্নী। জয় বলে ঠিক এভাবেই কি বাবা আর চাচা একত্রে হাত ধরাধরি করে ময়মনসিংহের দুর্গা মন্দিরে সেদিন নামেনি। কী হয়েছে? না থাকুক কোন স্মৃতিচিহ্ন! মা চাচা বাবার কোন স্মৃতিচিহ্ন নেই তাতে কি? আছে তাঁদের স্বপ্নসাধ, আকাঙ্ক্ষা। তাঁদের স্নেহ ভালবাসা আমাদের সাথে আছে। আমরা তো আছি। কি বল মা? নিশ্চুপ থেকো না। চোখের জলও ফেলো না। হিন্দুর মন্দিরে আজ আমরা দু'ভাই দাঁড়িয়ে। মুসলিম আর শিখ। কি আশ্চর্য! প্রতিজ্ঞা করলাম, বাবার স্বপ্নসাধের বাস্তবায়ন দেশের মাটিতে করবই। ভাই, তোমাকেও কিন্তু চাচার আকাঙ্ক্ষা আর স্বপ্নকে ভারতের মাটিতে প্রতিষ্ঠা করতেই হবে।' দু'ভাই মাকে প্রণাম করার পর উঠে দাঁড়ায়। সৃষ্টিকর্তার কৃপা কামনা করে। বুকে বুক মিলিয়ে দাঁড়ায়। মা কাছে টেনে আদরে-স্নেহে ওদের বুকে জড়িয়ে ধরে। দুই বীরের পুত্র ওরা দু'জন। আত্মগর্বে বলীয়ান। দু'জনে বলে 'মা আশীর্বাদ করো আমাদের।'

শেখর দত্ত রাজনীতিবিদ

নৃতত্ত্ব

বন্যেরা বনে সুন্দর শিশুরা মাতৃক্রোড়ে

পূর্ব ভারতের বোণ্ডা সম্প্রদায়

দীপিকা ঘোষ

ওড়িশা, ছত্তিশগড় এবং অন্ধ্র প্রদেশের সীমান্তজংশন হচ্ছে দক্ষিণ-পশ্চিম ওড়িশার মালকানগিরি জেলা। মালকানগিরির অরণ্যবেষ্টিত প্রত্যন্ত পাহাড়ি অঞ্চলে বাস করে ভারতবর্ষের এক আদিমতম ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী। নৃতাত্ত্বিক পরিভাষায় যাদের পরিচয় 'বোণ্ডা ট্রাইবাল পিওপল' হিসেবে। বোণ্ডাদের জীবনসংস্কৃতি বিশ্লেষণ করলে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, ভারতবর্ষের অন্যান্য আদিবাসীদের থেকে আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ আদিবাসীদের সঙ্গে এই নৃগোষ্ঠীর সম্পর্ক অনেক বেশি সুনিবিড়। এদের আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে নিবিড় সাদৃশ্য রয়েছে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের সেন্টিনেলিজ এবং অন্যান্য আদিবাসীদের– যাদের দেহের আকার ছোট; গায়ের চামড়া মসৃণ, ঘনকৃষ্ণ ও লোমহীন।

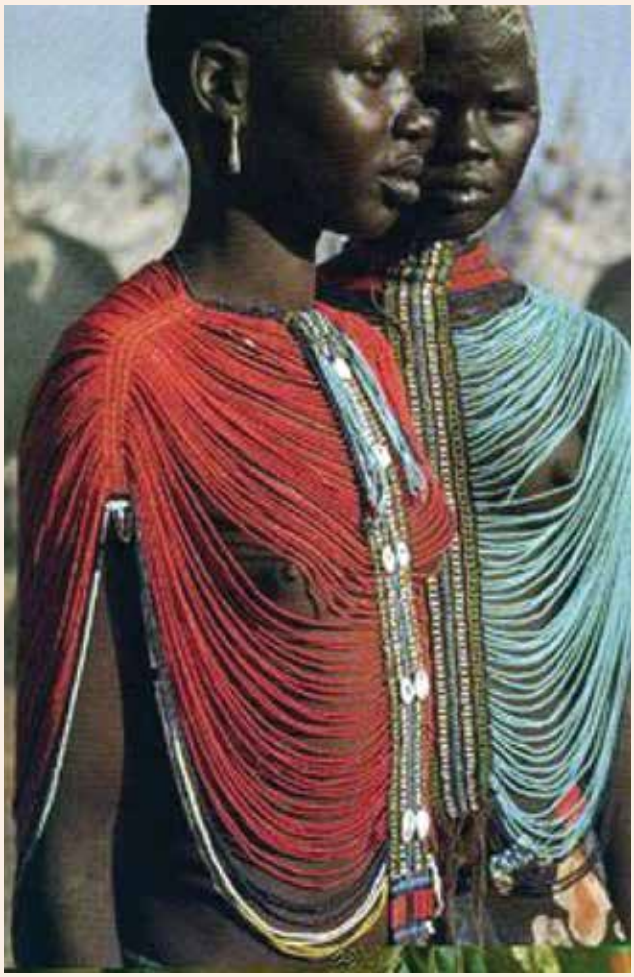

চুল কর্কশ, ঘাসের মত গুচ্ছ গুচ্ছ এবং অতি কুঞ্চিত। সাজসজ্জাতেও বিশেষ রকম সাজুয্য রয়েছে সাব-সাহারান অঞ্চলের 'মাশাই' উপজাতির সঙ্গে। সেন্টিনেলিজদের মত বোণ্ডারা আচরণে হিংস্র এবং 'Naked people' হওয়ায় ওড়িশা সরকার বোণ্ডা-অধ্যুষিত গ্রামগুলোতে ট্যুরিজম নিষিদ্ধ করেছেন।

নৃতাত্ত্বিক দিক থেকে বোণ্ডারা আফ্রো বা নেগ্রিটো জনগোষ্ঠীর সুদূর বংশধর– প্রায় ১০ লাখ বছর আগে যারা সাহারা মরুভূমি এবং সাব-সাহারান অঞ্চল থেকে এশিয়া মহাদেশে ছড়িয়ে পড়ে দলে দলে।

ফিলিপাইন, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড এবং মালোয়েশিয়াসহ সুনির্দিষ্ট কিছু অঞ্চলে যে আফ্রো নৃগোষ্ঠীর অস্তিত্ব এখনো চোখে পড়ে– তারা এই সাহারা এবং সাব-সাহারান মানুষদেরই উত্তরপুরুষ। *রামায়ণ*, *মহাভারতে*র যুগ সৃষ্টি হওয়ার হাজার হাজার বছর আগে এদের অস্তিত্ব ছিল প্রাগৈতিহাসিক ভারতের সমাজচিত্রে। ভারতের আর্য মানুষরা এদের কথা উল্লেখ করেছেন কখনো অসুর, কখনো আবার রাক্ষস সম্বোধনে। পুরাণ, উপপুরাণেও এদের বর্ণনা নানাভাবে উপস্থিত। ঐতিহাসিকভাবে বোণ্ডারা ভারতবর্ষের সবচাইতে প্রাচীন অধিবাসী। কারণ নৃতাত্ত্বিক ঐতিহাসিকদের মতে ভারতবর্ষের প্রাচীনতম জনসৌধের ভিত রচিত হয়েছিল নেগ্রিটো জনগোষ্ঠীর দ্বারা। এই সত্য উদ্‌ঘাটনে বিশ্বের একটি চিরন্তন বাস্তবতাও ধরা পড়ে। সেটি হল– স্বেচ্ছায় হোক কিংবা অনিচ্ছায়, পৃথিবীতে হিউম্যান মাইগ্রেশনের ঘটনা প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই চলছে।

মহাকালের অমোঘ নিয়মে নেগ্রিটো নরগোষ্ঠীর পরে মহাভারতের বিশাল অঞ্চল জুড়ে আবির্ভাব ঘটেছে আদি-অস্ট্রেলীয় জনগোষ্ঠীর। পরবর্তীকালে অন্যান্য নৃগোষ্ঠীর আগমনও হয়েছে এ অঞ্চলে। তাদের রক্তের সংমিশ্রণে সভ্যতা-সংস্কৃতির আদান-প্রদানে হাজার হাজার বছর ধরে উদ্ভূত হয়েছে নতুন আঙ্গিকে নতুন মানবজাতি– জন্ম নিয়েছে নতুন বিশ্বাস, নতুন সভ্যতা। তার প্রবল চাপে গুঁড়িয়ে গেছে আদিমতম, প্রাচীনতম মানুষগুলোর আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য। হারিয়ে গেছে ঐতিহ্যের প্রবহমানতা। কিন্তু তারপরেও মানবসভ্যতার অন্তরালে অবিকৃত অবস্থায় সূর্যের প্রবল আলোয় নিভু নিভু প্রদীপের মত বহুস্থানে তিরতির করে অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আদি সংস্কৃতির নৃগোষ্ঠী। মালকানগিরির অরণ্যবেষ্টিত পাহাড়ি মানুষ 'বোণ্ডা ট্রাইবাল পিওপল' তারই একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত– যারা হাজার হাজার বছর ধরে নিজস্ব ধারণাকে, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যকে, আঙ্গিক চেহারাকে নিজের সন্তানের মতই ভালবাসে। নিরন্তর দারিদ্র্য সহ্য করেও ঐতিহ্যের ধারাকে অক্ষত আর অক্ষুণ্ন রাখতে বছরের পর বছর ধরে চালিয়ে যায় কঠিনতর সংগ্রাম। আধুনিক সভ্যতার মূলস্রোতের সমাজ এবং মানবসম্প্রদায়কে সর্বতোভাবে এড়িয়ে চলেই তারা নিজেদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে চায়। ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে ওড়িশা সরকারের 'The Bonda Development Agency' প্রতিষ্ঠার বহু যুগ অতিক্রান্ত হওয়ার পরও তাই এখনো তাদের আকৃষ্ট করা যায়নি সেভাবে।

একুশ শতকের মূলস্রোতের মানুষ সমাজ সভ্যতা সংস্কৃতি সরকার এবং বিজ্ঞান-প্রযুক্তির সম্পূর্ণ নাগালের বাইরে হাজার বছরের অপরিবর্তিত প্রাচীন সংস্কৃতির মধ্যেই এরা বেঁচে থাকতে চায়। নৃতাত্ত্বিক সমাজবিজ্ঞানীরা প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে মানবজাতির যে কয়েকটি 'আনকন্ট্যাক্টেড কমিউনিটি'র অনুসন্ধান পেয়েছেন, পূর্ব ভারতের এই ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী তাদের যথার্থ প্রতিভূ। বাইরের সভ্যতার নিয়ম নিগড়ের বাইরে আজও যারা নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর। ব্রাজিলের নৃতাত্ত্বিক জোসে কার্লোস মেইরিলিসের মতে,

'The last free people on earth.' বোণ্ডাদের দুটো শ্রেণিবিভাগ রয়েছে। আপার এবং লোয়ার। আপার বোণ্ডারা খাড়া পাহাড়ের শীর্ষদেশে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে পাঁচ হাজার ফুট উঁচুতে আর লোয়ার বোণ্ডারা দুই থেকে আড়াই হাজার ফুট উচ্চতায় দরজা জানালাহীন মাটির কুটিরে বাস করে। ২০১১ এর সেন্সাস রিপোর্টে এদের জনসংখ্যা ছিল ১২ হাজার। আপার বোণ্ডাদের ৬০৭৭ এবং অবশিষ্ট সংখ্যা লোয়ার বোণ্ডাদের। ২০১৬-র আদমসুমারিতে এ সংখ্যা নেমে এসেছে অনেকখানি নিচের দিকে। দারিদ্র্য এবং অপুষ্টির কারণে এদের গড়আয়ু যেমন কমছে, তার ওপর ২০১৪ সালের অক্টোবরের ভয়াবহ সাইক্লোনে বোণ্ডাদের একটি বৃহৎ সংখ্যা চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে গেছে তাদের ভালবাসার পৃথিবী থেকে।

পৃথিবীর সবখানেই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নে অপরাপর জনগোষ্ঠীর বিস্ফোরণ ঘটলেও নির্জন প্রকৃতির কোলে আপন ঐতিহ্যের ছায়াতলে বসবাসরত বিভিন্ন আদিবাসী সম্প্রদায়ের অবস্থান আজ ভয়াবহ সংকটে দাঁড়িয়ে। এদের সংখ্যা ক্রমাগত কমতে কমতে অস্তিত্ব পৌঁছে গেছে বিপজ্জনক অবস্থায়। কালের নিয়মে ভাঙাগড়ার নিত্য খেলা সৃষ্টির আদিকাল থেকেই চলছে। কিন্তু আধুনিক সভ্যতায় এদের এমন পরিস্থিতির জন্য প্রধানত দায়ী সভ্যতাগর্বী মানবজাতির অনাকাঙ্ক্ষিত কর্মধারা। তাদের প্রয়োজন এবং অপ্রয়োজনের চাহিদা মেটাতে মেটাতে পুরো পৃথিবীই আজ ক্ষত-বিক্ষত। পৃথিবীর উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিমে আজ এমন কোন ভূ-ভাগ নেই যা মানুষের ভোগদখলের বাইরে। ঔপনিবেশিক যুগের নীতির ফলে যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত সমস্যা উদ্ভূত হয়ে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে, তাতে বিশ্বের অধিকাংশ আদিবাসী এবং উপজাতি প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। ডোমিন্যান্ট সোসাইটির প্রভাবে সমাজ-সংস্কৃতির উচ্ছেদকরণেও তারা বিলীন হয়ে গেছে সভ্যতার মূল জনস্রোতে। অরণ্য ধ্বংসের ফলে পর্যাপ্ত বন্যপ্রাণি না থাকায় শিকারি আদিবাসী জনসংখ্যা হ্রাস পেয়েছে ক্রমাগত। সর্বোপরি কৃষি উৎপাদনের ভূমি কেড়ে নিয়ে তাদের সর্বরিক্ত অবস্থায় ছুঁড়ে ফেলায় অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার পথও অবরুদ্ধ হয়েছে। পৃথিবী থেকে অজস্র উদ্ভিদ আর প্রাণিকুলের মত তাই হারিয়ে গেছে, হারিয়ে যাচ্ছে প্রাগৈতিহাসিক যুগের সাক্ষ্যবহনকারী অগণিত জনগোষ্ঠী এবং তাদের প্রকৃতিনির্ভর সহজ সরল অকৃত্রিম সমাজ-সংস্কৃতি।

অনেক আদিবাসী সমাজের মত মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার কারণে বোণ্ডা সমাজেও সংসারের সর্বময় কর্ত্রী নারীরা। সমাজ পরিচালনার দায়িত্ব থেকে অর্থনীতি সচল রাখার ভূমিকায় তারাই অবতীর্ণ। স্বামী নির্বাচনের অধিকারও মেয়েদের একচেটিয়া। বিয়ের পূর্বে অভিজ্ঞ বর্ষীয়ান নারীর পর্যবেক্ষণে থেকে পাত্রের সঙ্গে নির্জনে বসবাস করে পাত্রীরা তাদের যোগ্য স্বামী নির্বাচন করে নেয়। কিন্তু তারপরেও আফ্রো উপজাতিদের সুনির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্য ধারণ করায় ভারতের অন্যান্য আদিবাসী সমাজ থেকে বোণ্ডাদের জীবনচর্যা অনেকটা ব্যতিক্রমধর্মী। এদের সমাজ-সংস্কৃতি জীবন-পদ্ধতি একান্ত নিজস্ব। স্বামী হিসেবে বোণ্ডা ছেলেদের বয়সে কম করেও স্ত্রীদের থেকে ১০ থেকে ১৫ বছরের ছোট হতে হয়। ছেলেদের বিয়ের বয়স ১০ থেকে ১২ বছরের মধ্যে নির্ধারিত। মনে করা হয়, তুলনামূলকভাবে অল্পবয়সী শক্ত সমর্থ স্বামীরা বৃদ্ধবয়সী স্ত্রীদের সেবা শুশ্রূষা করবে। বোণ্ডা পুরুষরা অসামাজিক। স্বভাবে উগ্র। সহজেই উত্তেজিত হয়ে একে-অপরকে হত্যা করে। চোলাই মদ পান করে বেশিরভাগ সময়ই এরা মাতাল অবস্থায় অলস মুহূর্ত অতিবাহিত করে। ছেলেদের বিশেষভাবে পছন্দের বিষয়– নাচ, গান ও বন্যপ্রাণি শিকার। নিয়মিত নৃত্য এবং সংগীত পরিবেশন এদের জীবনযাপনের অঙ্গ। বোণ্ডা পুরুষদের মত নারীরাও মহুলী এবং সাগাই মদপানে অভ্যস্ত। বিশেষত গর্ভবতী মহিলারা গর্ভস্থ সন্তানের পরিপুষ্টির জন্য পুষ্টিকর পানীয় হিসেবে সাগাই মদ (ভাত থেকে তৈরি) নিয়মিত পান করে।

বোণ্ডাদের ঐতিহ্যবাহী সাজসজ্জা খুবই বর্ণাঢ্য। এই রঙ তৈরি হয় বিভিন্ন ধরনের শাকসব্জি আর গাছের নির্যাস রোদে শুকিয়ে। এদের সাজসজ্জায় রয়েছে শিল্পচেতনার স্পর্শ। তাদের প্রযুক্তিবিদ্যাও যথেষ্ট চিত্তাকর্ষক আর বুদ্ধিদীপ্ত। মেয়েরা হাতে, কানে, গলায় প্রচুর পরিমাণে তামা আর সিলভারের অলংকার পরে। প্রচুর অলংকার নারীদের সজ্জা এবং সম্মান– দুয়েরই পরিচায়ক। বোণ্ডা মেয়েরা কোমরে দু'তিন ইঞ্চি চওড়া এক টুকরো সিল্কের কাপড় (রিঙ্গা) জড়িয়ে রাখে। এসব উচ্চমানের কাপড় তারা নিজেরাই ঘরে তৈরি করে নেয়। সামনের ঊর্ধ্বাঙ্গ আবৃত করতে গলায় ঝুলিয়ে রাখে স্তরে স্তরে উজ্জ্বল রঙের পুঁতির মালা। মাথা কামিয়ে সব বয়সের নারীই শুকনো ঘাসের আস্তরণ পরে। আস্তরণ যাতে খুলে না পড়ে সেজন্য মালার মত রঙিন নেকলেস জড়িয়ে রাখে মাথার চারপাশে। এদের অর্থনৈতিক আদান প্রদান হয় হাজার বছরের পুরনো বিনিময় প্রথার মাধ্যমে। বাথানে গরুর সংখ্যা বেশি হলে সমাজে পরিবারকর্ত্রীদের গৌরব বৃদ্ধি পায়।

বোণ্ডাসমাজে ছেলেরাও অলংকার পরে। তবে সেটা বিয়ের পূর্বে। বিয়ের পরে সেই প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়। অন্যান্য অনেক আদিবাসীদের মত এরাও আদিম নিয়মে প্রকৃতির পূজারি। তবে আর্য ভারতের ইতিহাস ঐতিহ্যকেও তারা মানসিকতা অনুসারে নিজেদের সমাজ-সংস্কৃতিতে স্থান দিয়েছে। এদের সংস্কৃতিতে নারীদের স্বল্প বসন আর মাথা কামিয়ে রাখার পেছনে প্রচলিত আছে একটি কিংবদন্তী। কিংবদন্তীটি এরকম: দণ্ডকারণ্যে রাম-লক্ষ্মণের সঙ্গে অবস্থানকালে সীতাদেবী একদিন গভীর বনে নির্জন সাবেরি নদীতে পোশাক খুলে স্নান করছিলেন। হঠাৎ একদল উচ্চকিত রমণীর হাসিতে তিনি সচকিত হয়ে দেখেন, গাছের আড়াল থেকে তাঁকে লক্ষ্য করে নারীরা কৌতুক রহস্যে হেসে গড়িয়ে পড়ছে পরস্পরের গায়ে।

সীতাদেবী অভিশাপ দেন– এখন থেকে মাথা কামিয়ে, উলঙ্গ হয়ে থাকতে হবে তাদের। সেই থেকে বোণ্ডা রমণীরা সীতাদেবীকে শ্রদ্ধা জানাতেই তাঁর অভিশাপ বহন করে চলেছে আপন দেহে। বলা বাহুল্য, দণ্ডকারণ্য ছত্তিশগড় প্রদেশে আজও এক পবিত্রতম স্থান।

তবে এ কথা সত্যি, পৃথিবীর নানান প্রান্তের আদিবাসী অথবা উপজাতি সম্প্রদায়ের ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস এবং জীবনযাত্রায় পার্থক্য থাকলেও একটি বিশেষ উপলব্ধির ক্ষেত্রে তারা প্রত্যেকেই একসূত্রে গাঁথা। এরা প্রত্যেকেই প্রকৃতিকে, পৃথিবীকে, নিজের জীবনের মতই বাঁচিয়ে রাখতে চায়। এরা প্রত্যেকেই হাজার বছরের অভিজ্ঞতা থেকে জানে, প্রাকৃতিক জগতের সঙ্গে মানবজীবন অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা। নদ-নদী, গাছপালা, জীবজন্তু, পাহাড়-পর্বত, আকাশ-মাটি প্রত্যেকের ভাষা তাই এদের চেনা। যে ধরিত্রীর বুকে লক্ষ প্রজাতির প্রাণির জন্ম, যে পৃথিবী নিজের বক্ষে সমস্ত সৃষ্টি ধারণ করে সৃষ্টির প্রবহমানতা বাঁচিয়ে রাখে, তাকে এরা প্রতিদিন সেভাবেই দর্শন করে, যেভাবে হররোজ নিজের জননীকে চোখের সামনে মানুষ দেখতে পায়। আপন সন্তানের ভবিষ্যতের মতই এরা তাই উদ্বিগ্ন হয় বিপর্যস্ত পৃথিবীর ভবিষ্যতের কথা ভেবে। যে পৃথিবী তাদের চোখের সামনে তাদের মত ক্রমান্বয়ে কমজোর হয়ে যাচ্ছে প্রতিদিন।

জীবনের ধারণা ও মূল্যবোধ সম্পর্কে সরল অথচ সুগভীর চেতনা থেকেই যে এদের মধ্যে এমন উপলব্ধির জাগরণ, সেটা আদিবাসী অধিকার রক্ষার মুখপাত্র, আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব নেটিভ আমেরিকান ওরেন লায়ন্সের কথায় স্পষ্ট। তিনি বলেছেন– 'Our knowledge is profound and comes from living in one place for untold generations. It comes from watching the sun rise in the east and set in the west from the same place over great sections of time. We are as familiar with the lands, rivers and great seas that surround us as we are with the faces of our mothers. Indeed, we call the earth `Etenoha', our mother from whence all life springs'.

জীবনের এই মূল্যবোধ একুশ শতকের জনজীবনে ফিরিয়ে আনার জন্য আদিবাসী কিংবা উপজাতিদের জীবনসংস্কৃতি সংরক্ষণের তাগিদ আজ আন্তর্জাতিকভাবে জাগছে। এই সত্য বারবার ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা চলছে যে, The earth does not belong to human beings, human beings belong to earth। এই অনুভূতি আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর মানুষকে যাতে সচেতন করে তোলে সেজন্য বাস্তব পর্যায়ে আইনগতভাবে আদিবাসী অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিও সোচ্চার হচ্ছে বিশ্ব জুড়ে। ইতোমধ্যে তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতিকে সায়েন্স এডুকেশনের কারিকুলাম হিসেবে বিভিন্ন পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করার পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে। কিন্তু মানবসভ্যতার

প্রাক-ইতিহাসের দৃষ্টান্ত হিসেবেই কেবল এই আকর্ষণ আর আগ্রহ তৈরি হচ্ছে না আজ। তৈরি হচ্ছে অস্থিতিশীল আধুনিক বিশ্বের সুনির্দিষ্ট কিছু কার্যকারণের পরিপ্রেক্ষিতে। প্রিমিটিভ মানবসমাজ সমাজ-নৃবিজ্ঞানীদের গবেষণার বাইরেও পুরাতাত্ত্বিক, পদার্থবিদ, ভূ-পদার্থবিদ, জীববিজ্ঞানীদের আকর্ষণের বিষয় হয়ে তাই নতুন নতুন গবেষণার দ্বার উন্মোচন করে চলেছে সমস্যাসঙ্কুল শতাব্দীতে।

মনে করা হচ্ছে, বিশ্বায়নের কারণে উদ্ভূত অনেক সমস্যাই মোকাবিলা করা সম্ভব হবে এদের লাইফস্টাইল যথাসম্ভব স্ট্যাডি করা হলে। প্রযুক্তিনির্ভর পৃথিবীর সামনে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায়, প্রতিবেশগত সংকট দূরীকরণে, প্রকৃতিতে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে, প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহারে বিভিন্ন আদিবাসীর জ্ঞান আজ তাই গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর। কেন-না প্রবল প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থাকার অভিজ্ঞতা এদের অর্জিত। প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারও এরা জানে। এরাই জানে পৃথিবীকে শোষণের মাধ্যমে নিষ্পেষিত না করে জীবনধারণ করাই সর্বোত্তম পন্থা।

যা হোক, বিগত শতাব্দীগুলোয় ঔপনিবেশিক নীতি থেকে বিশ্বের বহু স্থানে আদিবাসী-উপজাতিকে হত্যা করা হলেও ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক ভারতে সব ধর্মের, সব সংস্কৃতির, সব সম্প্রদায়ের আশ্রয় গ্রহণের বাস্তবতা হাজার বছরের ইতিহাস। তাই যে অল্পসংখ্যক আদিবাসী সমাজ এখনো টিকে রয়েছে পৃথিবীতে, তাদের সংখ্যা সব চাইতে বেশি দক্ষিণ এশিয়ার এই বৃহত্তম রাষ্ট্রে। ভারতের মোট জনসংখ্যার সেন্সাস রিপোর্ট এদের গণনা করেই নির্মিত হয়। আদিবাসী অধিকার সুরক্ষায় সংবিধান অনুযায়ী কিছু কিছু পদক্ষেপও গৃহীত হয়েছে। এদের সম্পর্কে জ্ঞান আহরণের প্রথম পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছিল উনিশ শতকের শুরুতে ব্রিটিশ শাসিত ভারত সরকারের আগ্রহে। বর্তমান ভারতীয় সংবিধানের ৩৬৬ (২৫) ধারা অনুযায়ী অতি ক্ষয়িষ্ণুতার কারণে বোণ্ডারা 'তপসিলি উপজাতি' হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে ওড়িশা সরকার ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে 'The Bonda Development Agency' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিক্ষা, স্যানিটেশন, উপযুক্ত পানীয়জল সরবরাহের উদ্যোগ নিয়েছেন।

কিন্তু প্রশ্ন হল, আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় পর্যায়ে এদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য যে উদ্যোগ কিংবা পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে, তাতে আদিবাসী-উপজাতিদের জীবন-সংস্কৃতি, হাজার বছরের ঐতিহ্যচেতনা বেঁচে থাকতে পারবে তো? আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অকৃত্রিম সভ্যতার সঙ্গে প্রযুক্তিনির্ভর জটিল সংস্কৃতির কোলাকুলি সম্ভব হবে কি কোনদিন? আমাজান ক্রান্তীয় অঞ্চলের জঙ্গলের আদিবাসী থেকে অস্ট্রেলিয়ার উপজাতীয়দের ট্রাজিক পরিণতির কথা আজ বিশ্বব্যাপী সচেতন মানুষের জানা। যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডায় নেটিভ আমেরিকানদের রিজার্ভেশনের প্রতিশ্রুতি আদিবাসীদের জীবনে কী করুণ পরিণতি তৈরি করে চলেছে, সেই ইতিহাসও আজ সবার জানা। তাদের জীবনে মহামারি হিসেবে দেখা

তাদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য ফিরিয়ে দেওয়া হোক জমির অধিকার। ফিরিয়ে দেওয়া হোক তাদের অরণ্যজীবনের অনাবিল পরিবেশ, তাদের নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, আকাশ-মাটি, পাখির গান, ঝর্নার কলতান, তাদের স্বচ্ছন্দ বিচরণের অবাধ ক্ষেত্র, তাদের জীবনসংস্কৃতি, ধর্মবিশ্বাস, আচার এবং ঐতিহ্য।

দিয়েছে অ্যালকোহলিজম, হতাশা, ডায়াবেটিস, আত্মহত্যার প্রবলতাসহ এমন সব অজস্র জটিলতা, হোয়াইট মানুষদের সঙ্গে পরিচয়ের পূর্বে তাদের সহজ সরল জীবনে যেগুলোর অস্তিত্ব কোনদিন ছিল না। ক্রান্তীয় অঞ্চলের জঙ্গলের বন্য মানুষদের আধুনিক মেডিক্যাল শাস্ত্রের চিকিৎসা দিতে গিয়েও ফলোদয় কিছু হয়নি। বরং এই 'আনকট্যাক্টটেড ট্রাইবদের' ৫০% থেকে ৮০% প্রথমবার বাইরের মানুষের সংস্পর্শে এসেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল। কারণ বিশ্বায়ন যুগের মানুষের মধ্যে যে ধরনের রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা রয়েছে, প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্যে হাজার হাজার বছর ধরে বেঁচে থাকা মানুষগুলোর মধ্যে সেটা একবারেই অনুপস্থিত।

তাই একুশ শতকের জনজীবনে স্থৈর্য ফিরিয়ে আনার জন্য যদি আদিবাসী কিংবা উপজাতিদের জীবন-সংস্কৃতি সংরক্ষণের তাগিদ আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ে আজ অনুভূত হয়, তাহলে আধুনিক সভ্যতার সঙ্গে উপজাতীয়দের জীবনের সংযুক্তি ঘটিয়ে তার সুফল পাওয়া সম্ভব কিনা সে বিষয়ে গভীরভাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন। যদি মনে করা হয়, আধুনিক প্রযুক্তি আদিম সংস্কৃতির মানুষগুলোর জীবনে উন্নয়ন ঘটাবে, তাহলে এটুকু নিশ্চয় বলা যেতে পারে– এদের অনেকেই এর ফলে ভাল গায়ক, লেখক, সাংবাদিক অথবা চলচ্চিত্রকার হয়ে হয়তো তাদের জীবনগাথা বাইরের বিশ্বকে শোনাতে পারবে। কিন্তু হাজার হাজার বছর আগেকার পূর্বপুরুষদের অনুসরিত লাইফস্টাইল অনুসরণ করে জীবনের যে মূল্যায়নে তারা বিশ্বাস করতে শিখেছে, তার নাগাল কোনদিনও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

বরং তাদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য ফিরিয়ে দেওয়া হোক জমির অধিকার। ফিরিয়ে দেওয়া হোক তাদের অরণ্যজীবনের অনাবিল পরিবেশ, তাদের নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, আকাশ-মাটি, পাখির গান, ঝর্নার কলতান, তাদের স্বচ্ছন্দ বিচরণের অবাধ ক্ষেত্র, তাদের জীবনসংস্কৃতি, ধর্মবিশ্বাস, আচার এবং ঐতিহ্য। তাহলেই আবার তারা নতুন করে বেঁচে উঠবে বসন্তে জন্ম নেওয়া সতেজ কিশলয়ের মত। স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য, আনন্দে ঝলমল করে উঠবে পরিপূর্ণ জীবনতরঙ্গে ভেসে– আধুনিক সমাজের মানুষ যাকে ধারণ করতে অক্ষম। অতএব অজস্র আদিবাসী-উপজাতির মত বোণ্ডারাও যেমন চাইছে বাইরের সমাজের সংস্পর্শের বাইরে নিজেদের চিরকালীন আনন্দ বেদনার অন্তরঙ্গতায় বেঁচে থাকতে, সেভাবেই থাক না তারা। ক্রান্তীয় অঞ্চলের জঙ্গলে চিকিৎসা দিতে গিয়ে সেই মার্কিন ডাক্তার যেমন বলেছিলেন– 'We should leave them alone'. যেমন সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র বলেছিলেন– 'বন্যরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে'।

দীপিকা ঘোষ
প্রবাসী কথাসাহিত্যিক

ছোটগল্প

অদৃশ্য মানুষ

শ্যামল দত্তচৌধুরী

আজ *দৈনিক এখন*-এর সম্পাদকীয় পড়বার পরে মনে মনে অশান্তি বোধ করছি। প্রতিবাদ জানাতে ইচ্ছে করছে। গতকাল ছিল কালী পূজা। আমিও পঁচাশি বছর পূর্ণ করলাম। সারারাত টিভির পর্দায় চার প্রহরের পুজো দেখলাম। কালীকে আমার ভারী পছন্দ। মোটেই তাঁকে ভয়ংকরী মনে হয় না, বরং এক ল্যাবণ্যময়ী কিশোরী মনে হয়– যেন একটি জেদি, অভিমানী মেয়ে অথচ যার অন্তরে লজ্জা ও কৌতুকপ্রিয়তা পূর্ণমাত্রায় ক্রিয়াশীল।

দু'জন আয়ার নিয়ন্ত্রণে আমার দিন ও রাত কাটে। তারা সরস্বতী ও মেনকা। ওদের হুকুমমত আমাকে চলতে হয়, আমার নিজস্ব ভাল-লাগা মন্দ-লাগা বলে কিছু নেই। কালীপুজো উপলক্ষে মেনকা তিন দিনের ছুটি চেয়েছিল। দোষের মধ্যে মেনকাকে বলেছিলাম, তুই ছুটি নিলে আমার চলবে কী করে? যেতে হলে অন্য কোনও বদলি ব্যবস্থা করে যা– এই কথায় তার গোঁসা হয়েছে। আমার বিরুদ্ধে সে নিঃশব্দে অসভ্য আচরণ আরম্ভ করেছে।

ফ্রিজের ঠাণ্ডা খাবার খেতে দেয়। বললেও গরম করে না। সকালে চা দেয়নি আমাকে টয়লেটে রেখেই বাইরের দরজা খুলে চলে গেছে। ভাগ্যক্রমে সরস্বতী ডিউটি টাইমের আগেই চলে এসেছিল, নইলে অনর্থ ঘটতে পারত। মন খিঁচড়ে আছে, তবু মুখ্য সম্পাদকীয় পাঠ করে আমি রাইটিং প্যাড ও পেন টেনে চিঠি লিখতে বসলাম।

সম্পাদক, *দৈনিক এখন*, ৩১ অক্টোবর
১৮ কার্তিক সংখ্যার সম্পাদকীয় পড়লাম। দুঃখিত, আমি সহমত হতে পারছি না। আপনি লিখেছেন সংস্কৃতিমনস্ক বাঙালি কখনও কালীপূজাকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পারে নাই। মুণ্ডমালা-পরিহিতা, করালবদনী, শোণিত পিপাসু অনার্য দেবীটি সুশোভন নহে।...

আশ্চর্য! কালীমূর্তি যদি বাঙালির রুচিবোধকে এতটাই পীড়িত করে থাকে তাহলে বাংলায় শাক্ত ধর্ম এমন প্রসার লাভ করল কী করে? এই চিঠি আপনার সংবাদপত্রে প্রকাশ করলে আনন্দিত হব।

এই পাড়ার ছেলে লালন এবার পুরসভার নির্বাচনে জিতেছে। ইদানীং শুনলাম আমার বাড়ির সামনেই আবর্জনার ভ্যাট নির্মিত হয়েছে। জঞ্জাল জমে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। নর্দমা উপচিয়ে পয়ঃপ্রণালীর দূষিত জল রাস্তা প্লাবিত করেছে। সরস্বতী-মেনকার আসা-যাওয়া করতে বেশ অসুবিধে হচ্ছে। লালনের নামে একটা চিঠি লিখে আমি সরস্বতীর হাতে পাঠিয়েছিলাম। লালনকে ছোট থেকে চিনি। রাগ করে লিখেছিলাম, 'ভোটের আগে তুমি দ্বারে দ্বারে ভোট ভিক্ষা করেছিল, জেতার পরে তোমার নাকি টিকিটাও দেখা যায় না!' শুনতে পেলাম, লালন তাতে ক্ষুব্ধ হয়েছে। ওর একজন সাগরেদ, নাম পঞ্চা, চোখ রাঙিয়ে সরস্বতীকে বলেছে– ঠাকুমাকে বলে দিস, লালনদার টিকি নেই। এই ওয়ার্ডে লালন নাকি একুশটা কালী ও জগদ্ধাত্রী পূজার সভাপতি। ওর সময়ের একান্তই অভাব। পঞ্চা আমাকে উদ্যোগী হয়ে জনমত গঠন করার পরামর্শ দিয়েছে। কী বিপদ! আমি একজন হুইল চেয়ার-বন্দী অশীতিপর বৃদ্ধা। কোনওদিন করিনি, আজ হঠাৎ এই বয়সে জনমত গঠন করব কী করে?

যদিও ইংরেজি লেখা পড়তে পারে না, সরস্বতী আর মেনকা তবু যে কী কৌশলে রিমোটে অভ্রান্তভাবে টিভির হিন্দি সিনেমার চ্যানেল ধরে ফেলে, সে এক বিস্ময়! ওরা অত্যন্ত উচ্চগ্রামে টিভি চালাতে পছন্দ করে। পাছে ওরা মনঃক্ষুণ্ন হয় সেই ভয়ে চুপ করে থাকি। ওরা দু'জনে আমার বল-ভরসা। বাজারহাট, রান্নাবান্না, ঘরের কাজ, ব্যাংক-পোস্ট অফিসের যাবতীয় কর্ম ওরাই করে দেয়। যেমন চায় তেমন টাকা আমি ওদের হাতে দিই। হিসেব চাইলে বিরক্ত হত বলে আর চাই না।

আমার দুই ছেলেই কৃতী। বড় খোকা ডাক্তার, প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর সে কানাডায় প্রবাসী। বড় বউমা– মালবিকা। মালবিকার মা-বাবার শেষ জীবনটা উত্তরপাড়ার এক বৃদ্ধাবাসে কেটেছিল। বড় খোকার তিন মেয়ে। মালবিকা নিয়মিত ক্রিসমাস কার্ড পাঠায় আমাকে। মেনকার ডিউটি রাতে। সে রোজ গজগজ করে, তোমার বাড়িতে রাতের বেলা আসতে ভয় করে দিদিমা, তুমি এমএলএ-কে লেখো। আমার বর তার ড্রাইভারকে চেনে, ঠিক জায়গায় চিঠি পৌঁছে দেবে। অগত্যা লিখলাম:

মাননীয় বিধায়ক, ২৭ নভেম্বর
এই ওয়ার্ডের কাউন্সিলার লালন কি আপনাদের দলের ছেলে? আমার বাড়ির সামনে সে নোংরা ভ্যাট বানিয়েছে। অভিযোগ কানেও তোলে না।

তাছাড়া সন্ধ্যা নামলেই এই পাড়ার যত রাজ্যের অসামাজিক কর্ম আরম্ভ হয়েছে। চুরি ছিনতাই খুব বেড়ে গেছে। আমি প্রবীণ নাগরিক, একলা থাকি। ভয়ে করে।
বিনীতা **বনানী মল্লিক**

সেই যে কালীপূজা সম্পর্কিত সম্পাদকীয়র সমালোচনা করে চিঠি লিখেছিলাম তারপরে তিন মাস কেটে গেছে। চিঠি প্রকাশিত হয়নি। বিরুদ্ধ মতামতে সম্পাদক অসন্তুষ্ট হয়েছেন কি না কে জানে। তবু রিমাইন্ডার হিসেবে তাঁকে আর একটা চিঠি দিলাম।

ইদানীং কয়েকটা ভাবনা আমার মাথায় ঘুরছিল। গণতন্ত্রে ভোটের ভূমিকাই মুখ্য। অথচ, শুনতে পাই, লোকের মনে নির্বাচনে অংশ নেবার তাগিদ কমে যাচ্ছে। গড়পড়তা সত্তর শতাংশ ভোটের বিচারেই সরকার গঠন হয়ে থাকে। ব্যাপারটা প্রবন্ধ আকারে লিখে *দেশ-কাল* মাসিক পত্রে পাঠিয়ে দিলাম।

মাননীয় সম্পাদক, ১৯ জানুয়ারি
মাসিক *দেশ-কাল* পত্রিকায় প্রকাশের জন্য 'গণতন্ত্রে সংখ্যাতত্ত্ব' শিরোনামে একটা প্রবন্ধ পাঠালাম। ছেপে বেরলে একটা কপি পাব কি? নইলে, প্রকাশিত হবে, এই খবর পেলে আমি দোকান থেকে কিনে নেব।
বিনীতা **বনানী মল্লিক**

স্নেহের বড়খোকা,
কিছুদিন যাবৎ তোর কথা খুব মনে হচ্ছে। মনে আছে, সেই যে-বার প্লেনের ধাক্কায় ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের টুইন টাওয়ার ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, তার চার মাস পরে তুই আর মালবিকা কলকাতায় এসেছিলি মালবিকার বাবার আদ্যশ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করতে। তাই না?

আমি ভাল আছি, খুবই ভাল আছি। তুই আর ছোটখোকা আমার কোনও আর্থিক অভাব রাখিসনি। তোর ও মালবিকার, তোদের তিন মেয়ে সুজয়া, রুচি ও বার্বির মাথায় তোর বাবা ও আমার অজস্র আশীর্বাদ সর্বদা বর্ষিত হচ্ছে, এই বিশ্বাস রাখিস। তোর দুই জামাই দলজিৎ আলফ্রেডকে আমার আন্তরিক ভালবাসা। সুজয়া ও রুচি এখন কোথায় থাকে? বার্বির আঠারো বছরের জন্মদিনের ছবি মালবিকা আমাকে পাঠিয়েছিল।

আমার সামনের দেওয়ালে তোর তিন বছর বয়সের একটা ছবি ফ্রেমে ঝুলছে। তোর শৈশবের মুখ যেন বার্বির মুখে অবিকল বসানো। সেই সময় অনেকেই তোকে আমার কন্যা বলে ভুল করত।

আমার ঘরে টেলিফোনের ল্যান্ড লাইন হামেশা বিকল হয়ে পড়ে। সেল ফোন রাখিনি। চোখের যা অবস্থা, সঠিক নম্বর টেপার সম্ভাবনা নেই। টিভিতে শুনলাম তোদের ওখানে ভারী তুষারপাত হয়ে তিনদিন জনজীবন স্তব্ধ ছিল।
আশীর্বাদিকা মা

মেনকার তাড়নায় আবার লিখতে হল:
মাননীয় বিধায়ক, ১০জুলাই
আমার অভিযোগগুলোর কী প্রতিকার করলেন বুঝতে পারলাম না। পাড়ায় অপকর্ম সমানেই চলছে। আমার সেবিকার বর বলেছে, আপনি নাকি স্থানীয় পুলিশ থানাতে অবিলম্বে অসামাজিক কার্যকলাপ বন্ধ করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

নির্দেশ দিয়েই কি দায়িত্ব শেষ? শোনা যায়, আপনারা জনগণের কল্যাণের জন্য পলিটিক্স করতে আসেন। পাঁচ বছর পরে দেখা যায় জনগণের তুলনায় নিজের কল্যাণসাধন করেছেন অনেক বেশি। আমি জনৈকা বৃদ্ধা ভোটার। হুইল চেয়ারে বসে ভোট দিতে যাই। বড় বেশি ক্ষোভ, দুঃখ ও ক্রোধ জমেছে বুকে। সিস্টেম আমাকে কি কেবল একটা ভোট হিসেবে গণ্য করে। একটা সংখ্যা?
বিনীতা **বনানী মল্লিক**

অফিসার-ইনচার্জ, স্নেহভাজনেষু, ১৭ জুলাই
আমাদের এলাকার পুরো উদ্যমে অসামাজিক কার্যকলাপ চলছে। শুনলাম মাননীয় বিধায়ক আপনাকে সমস্ত অপকর্ম বন্ধ করতে বলেছেন।

আমার সেবিকা আপনার থানায় দেখা করতে গিয়েছিল। আপনি বলেছেন, কোনরকম নির্দেশ আপনার কাছে আসেনি। তাছাড়া ওইসব অপর্কমের কথা আপনি কিছুই জানেন না। কী মুশকিল, চক্ষু বুজে থাকলে কি দায় এড়ানো যায়? নাকের ডগায় যে-সব অসামাজিক কর্ম চলছে তার খবর কি আপনার কাছে নেই? কী ছাইয়ের দারোগা হয়েছ বাবা। তুমি আমার ছেলের চেয়ে ছোট, তাই তুমি বলেছি।
আশীর্বাদিকা **বনানী মল্লিক**

মাননীয় সম্পাদক, *দৈনিক এখন*, ৩ নভেম্বর
আমার কালী পূজা সংক্রান্ত চিঠি কি অমনোনীত হল?
বিনীতা **বনানী মল্লিক**

মাননীয় সম্পাদক, *দেশ-কাল*, ৮ নভেম্বর
'গণতন্ত্রে সংখ্যাতত্ত্ব' নামে একটা প্রবন্ধ পাঠিয়েছিলাম। তারপর দু-বছর কেটে গেছে। মনোনীত/অমনোনীত বিষয়ে কোনও খবর পাইনি। যদি হঠাৎ আমার অজ্ঞাতে প্রকাশিত হয়ে যায় সেই ভয়ে মাসিকপত্রের প্রত্যেক সংখ্যা কিনতে হচ্ছে। অপনাদের নীরবতা কি পত্রিকার বিক্রি বাড়াবার কোনও কৌশল?
বিনীতা **বনানী মল্লিক**

অতি আদরের ছোটখোকা, ১৩ ডিসেম্বর
পুনের এক সিনেমা হলে ব্লাস্ট হয়েছে। শুনে বুকে কেঁপে উঠল। তোরা সকলে কুশলে আছিস তো? বড় চিন্তা হয় রে।

আমার টেলিফোনটা হঠাৎ একদিন জীবিত হয়ে উঠেছিল, তারপর যথারীতি কোমায় চলে গেছে। যখন সাময়িক প্রাণ সঞ্চার হয়েছিল তখন একবার বেজে উঠেছিল। মনে হল যেন এসটিডি– টানা টানা ঝংকার। রিসিভার তুলতেই লাইন কেটে গেল। চেতনে বা অবচেতনে বোধ হল যেন তার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। তুই কি আমাকে কল করেছিলি? আমার খুব গ্লানিবোধ হচ্ছে রে ছোটখোকা, তুই শত ব্যস্ততার মধ্যে কষ্ট করে আমাকে কল করলি, আমার এমন কপাল, লাইন কেটে গেল। তোকে শেষ দেখেছিলাম চার বছর আগে।

তুই অফিসের কাজে কলকাতায় এসে দু'দিন বড় হোটেলে কাটিয়েছিলি। তবু কোনওমতে সময় বের করে ফ্লাইট ধরতে যাওয়ার পথে আমাকে দেখতে এসেছিলি। এক ঘণ্টার মত ছিলি আমার পাশটিতে, অবশ্য ক্রমাগত কাদের সঙ্গে যেন ফোনে কাজের কথা বলছিলি। ওই সময়টুকু যেন আমার নির্ঝরে স্নান করার মত আনন্দে কেটেছিল। আমি খুব ভাল আছি রে, ছোটখোকা। আদরের নাতিদের ভালবাসা।

চিফ রিপোর্টার *জনমত* টিভি চ্যানেল, ৪ মে
তুমি কোন পদে আছ আমি জানি না। তোমাকে আমার বেশ লাগে। তুমিও মাঝে মাঝে আমার ছোট ছেলের মত ম্যাক্রোলেভেল, ইউএসপি, সিনার্জি, মাল্টিটাস্কিং, বটমলাইন ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করে থাকো। আমি যখন বেথুনে পড়তাম তখন এই শব্দগুলো আবিষ্কার হয়নি। বেশ লাগে শুনতে।

প্রবীণ নাগরিকদের সমস্যাবিষয়ক এক মনোজ্ঞ আলোচনা তোমার চ্যানেলে শুনলাম। বিদগ্ধ পণ্ডিতেরা অংশগ্রহণ করেছিলেন। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক প্রভু চাকলাদার বাংলায় কথা বলবার চেষ্টা না করলে হয়তো আরও কিছু বোধগম্য হত।

দু'বেলা আমার জন্য দু'জন উচ্চ বেতনভুক্ত সেবিকা নিযুক্ত আছে। তারা যেন আমাকে মানুষ বলে গণ্য করে না। আমার চোখের সামনে কাপড়-শায়া-ব্লাউজ বদল করে। রাতে বারংবার বেডপ্যানের জন্য মিনতি করলেও কর্ণপাত করে না। ঘুমানোর ভান করে, অথবা বিরক্তিসূচক শব্দ করে পাশ ফিরে শোয়। চাপা স্বরে গালিগালাজ করে। আমি টয়লেটে থাকলে কখনও আচমকা দরজা ঠেলে ভেতরে ঢোকে আর আমার উপস্থিতির তোয়াক্কা না করে সামনে বসে কাপড় কাচতে লেগে যায়। ওরা আমাকে 'বুড়ি মাগি' বলে উল্লেখ করে।

আমি যে সশরীরে বিদ্যমান, যেন ওরা দেখতে পায় না। এই বিষয়ে তোমার পণ্ডিতেরা কী বলেন?
বিনীতা **বনানী মল্লিক**

মাননীয় সম্পাদক, *দৈনিক এখন*, ২৫ জুলাই
আপনার সংবাদপত্রে বাঁকুড়ার এক গ্রামের ঘটনা পড়লাম। একজন বেকার যুবক তার ঠাকুমা, বিধবা মা আর দুই বোনকে নৃশংসভাবে কাস্তে দিয়ে কেটেছে। স্বীকারোক্তিতে সে পুলিশকে বলেছে, জীবনের ঘাটে-ঘাটে নিরাশ ও প্রত্যাখাত হতে হতে সে ক্লান্ত। কেউ যেন তাকে চোখে দেখতে পায় না। সে বেঁচে আছে, তার অস্তিত্ব আছে– এই সত্য প্রমাণ করতেই সে ওই পৈশাচিক কর্ম করেছে। সন্দেহ নেই, ছেলেটা বদ্ধ উন্মাদ। কিন্তু একজন মানুষ কেন নিজেকে সমাজে বাতিল ভাববে? লোকের ভিড়ে বাস করেও কেন সে এক অদৃশ্য মানুষের মত অবহেলিত হতে থাকবে।

নিজের প্রয়োজনে না লাগলে একজন মানুষ অন্য একজনকে বোধহয়

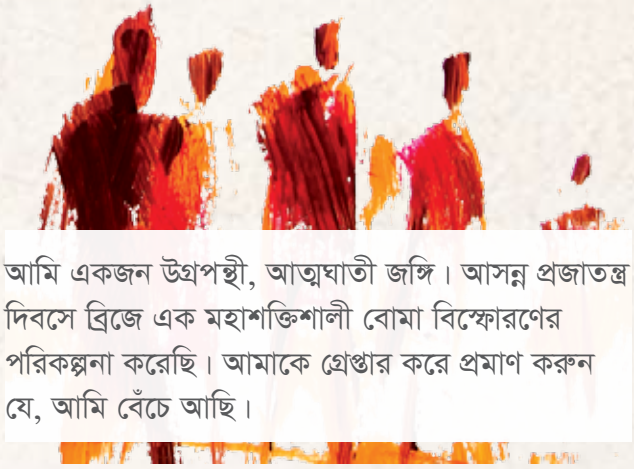

আমি একজন উগ্রপন্থী, আত্মঘাতী জঙ্গি। আসন্ন প্রজাতন্ত্র দিবসে ব্রিজে এক মহাশক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণের পরিকল্পনা করেছি। আমাকে গ্রেপ্তার করে প্রমাণ করুন যে, আমি বেঁচে আছি।

আজকাল দেখতে পায় না। কেবল যেন স্বার্থের সম্পর্ক। আমার একদা বেথুনের বান্ধবী করবীর মেয়ে কলকাতায় এলে অন্তত একবার দেখা করে যায়। সে বলে গেল– মাসি, আজকের নবীন প্রজন্মের অনেকেই মাসে লাখ-দেড়লাখ টাকা উপার্জন করে। তাদের কাছে উইক-এন্ডে এক সন্ধ্যায় আট-দশ হাজার টাকা খরচ করা কিংবা ব্র্যান্ডেড জিনস্ বা জুতো বার-চোদ্দ হাজার টাকায় কেনা খুবই সামান্য ব্যাপার। কিন্তু তারা গরিব দুঃখীদের জন্য দু'একশো টাকা দান করতেও নারাজ– প্রশ্ন করবে, ইনকাম ট্যাক্স বেনিফিট পাব কি? অথচ জানেন, আমার স্বামীকে দেখেছি সীমিত সামর্থ্যেও মধ্যেও ভাগ্যহীনদের যথাসাধ্য সাহায্য করার চেষ্টা করতেন।

আপনার কাগজে ছাপবার জন্য এই পত্র লিখছি না। ওই বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতা নিদারুণ তিক্ত। কালীপূজা সংক্রান্ত পত্র চার বছর পরেও প্রকাশিত হল না।
বিনীতা **বনানী মল্লিক**

চিফ রিপোর্টার, *জনমত* চ্যানেল, ৩ সেপ্টেম্বর
কেউ আমার কথা শুনতে পায় না কেন? আমি এখনও দিব্যি বেঁচে আছি, খেয়েপরে শ্বাসপ্রশ্বাস ছেড়ে রীতিমত বেঁচে আছি। এসময় আমার ছেলেরা আমাকে নিজের কাছে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু নববধূ বেশে আঠারো বছর বয়সে এই বাড়িতে আমার প্রথম আগমন। আমার শ্বশুর-শাশুড়ি এখানেই শেষ নিঃশ্বাষ ত্যাগ করেছেন। নিশ্চিন্ত মাতৃগর্ভের মত এই আশ্রয় ছেড়ে কোথায় যাব?

বৃদ্ধাবাসের শরণ নিতে আমার মর্যাদায় লাগে। লোকে আমার ছেলেদের হীন ভাবতে পারে। তাছাড়া এই বাড়িতে সারাজীবন মাথা উঁচু করে বাস করেছি। আজ একলা পড়ে গেছি, তবু কারও অনুকম্পা সহ্য হবে না।

কেউ আমার চিঠির উত্তর দেয় না কেন? যেন চারদিকে উঁচু উঁচু পাহাড়, আমার আর্তনাদ প্রতিহত হচ্ছে অথচ কোনও প্রতিধ্বনি নেই। এই বিষয়ে তোমার পণ্ডিতেরা কি বলেন?
বিনীতা **বনানী মল্লিক**

মহামান্য পুলিশ প্রধান, ৫ জানুয়ারি
আমি একজন উগ্রপন্থী, আত্মঘাতী জঙ্গি। আসন্ন প্রজাতন্ত্র দিবসে ব্রিজে এক মহাশক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণের পরিকল্পনা করেছি। আমাকে গ্রেপ্তার করে প্রমাণ করুন যে, আমি বেঁচে আছি।
বিনীতা **বনানী মল্লিক**

বনানী মল্লিক, ২৬ জানুয়ারি
মাননীয় নগরপাল মশাই স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের প্রশাসনিক কাঠামো পর্যবেক্ষণ করতে বিদেশে গিয়েছেন। তিনি ফিরে এসে নিশ্চয় আপনার অভিযোগের প্রতিকার করবেন।
স্বাক্ষর **অস্পষ্ট**
(আপ্ত সহায়ক)

শ্যামল দত্ত চৌধুরী ভারতের ছোটগল্পকার

আমাদের কাচপোকারা

এস এম তিতুমীর

(কবি জীবনানন্দ দাশ স্মরণে)
কি অজানা টানে, অপার আকর্ষণে
খসে পড়ছে কত পাতা
– ফুরিয়েছে বুঝি শিকড়ের রস
শরীর হয়তো ব্যথাহীন– অবশ

পড়ন্ত বেলায় বেজে ওঠে মর্মরধ্বনি
গা বেয়ে লেগে থাকে স্মৃতির লতা
গ্রাসিছে হয়তো মাটি, তোমার আহ্বানে–
শুকোবার অলসতা।

এই কি জীবন অস্ফুট ব্যথার নিঃসঙ্গতা
কানামাছি রোদ নীলিমার মেঘে খেলছে কত
ডানপিটে বেলা ঘুঘুর ডানায় কতকাল অবিরত।

এসেছে হেমন্ত কৃষকের চোখে ফসলের রং মেখে
কুয়াশার জলে ভিজে শস্যের অঙ্কুর দেখে দেখে
ভেসে গেছে সব চোখ ছেঁড়া ঘুড়ি হাতে নিয়ে
বাতাস হয়েছে ভারি বুক খালি করা শূন্যতা দিয়ে।

পাখা ভাঙা হাজারো ফড়িং ভেসে যায় জলাঙ্গি স্রোতে
কোথায় আছেন সেই নিঃশর্ত একা জন
ঢেউ ভেঙে আসে মাঝি জানে না তারা

বুকভরা কাব্যরা হাসে তার– তবু
তাকে ছাড়া এখনো এখানে কাঁদে
আমাদের কাচপোকারা।

বিষণ্ন বসন্ত

নিজাম উদ্দিন আহমেদ

বসন্তে এবার কোকিল ডেকেছিল
মধুমাসে মধুও ছিল।
বর্ষায় দু'কুল উপচে জল প্রবাহিত হলে
আটকাবার কোন উপায় নেই।

শরতে ঢাক বাজবে, শিউলি হাসনা হেনা হাসবে
অভাগার আর হাসা হবে না।
হেমন্তে নবান্নের গন্ধে মৌ মৌ হবে চারদিক
কেউ নেই অভাগাকে আমন্ত্রণ জানাবার।
শীতে কাঁপুনি এলে
শরীরে বালাপোশ কে দেবে ঢেকে?

তখনো কি ভাল বাসবে না?

আর্তি

দ্বিজেন্দ্রলাল আচার্য

নতজানু তোমার সমীপে
'ইচ্ছামৃত্যু' বর চাই
যেন, এই নগ্ন সমিধ শরীর প্রজ্বলিত অগ্নি হয়ে
শীতার্ত গহীন রাতে তোমার নিলয়ে
আমার তো ঘর নেই। পরিযায়ী পাখি
আমরণ নীড়ের সন্ধানে...

গান ভালবাসো তাই পাখি হয়ে কাঁদি
সুগন্ধ ছড়িয়ে দিই উতল বাতাসে
তোমার চলার পথে বুক পেতে রাখি
দগ্ধ ঘাসে

যে নদী হারাল বাঁকে, তাকে তুমি
কখনো ডাকোনি
নিরন্তর জলস্রোতে স্খলিত বসন
যৌনগন্ধ, তীব্র অনুভূতি–
এইসব স্মৃতি নিয়ে ভিন্ন গ্রহবাসী
পুড়ে যাচ্ছি অহর্নিশ নিষিদ্ধ আগুনে–
একবার মুখ তুলে দেখবে না তুমি?

সত্যকামজননী

দুখু বাঙাল

'বল হে জননী মম, বল তবে কি আমার গোত্রপরিচয়'
মাতৃত্ব গ্রাস করে এই শক্তি পৃথিবীর অর্জিত হয়নি এখনো
জাবালার রাজনীতি ছিল কি-না, এ যে আজ অজানা অধ্যায়
সন্তানের প্রশ্নবাণে বাষ্পরুদ্ধ জননীর মাতৃত্বের অফুরান আলো
মুহূর্তেই ঢেকে দিল পৃথিবীর অন্ধকার– আত্মজের পিতৃপরিচয়।

হায় আরাকান, রক্তস্রোতে ভেসে আসা দিগভ্রান্ত মানুষের ঢল
পৃথিবী চিনিল যাকে একডাকে-একনামে– রোহিঙ্গা-রাখাইন
শুধু চিনিল না একবারও নয়শত বছরের বালকের বিস্মৃত মা
আপনার পেটে ধরা হয়তো বা গালি কোন রোহিঙ্গাসন্তান
মায়ানমারজননী এক বৃত্তবন্দী অশ্রুশূন্যা সু চি, অং সান।

মহাত্মাকে ছুঁয়ে যেতে ডাক দিয়ে ফিরে গেল রুদ্র মহাকাল
বুদ্ধবাণী– 'জীবহত্যা মহাপাপ' কোন ডাক শুনিলেন তিনি?
অক্ষমের আস্ফালন– আছাড় মারে পৃথিবীকে, ফের চায় ক্ষমা
রোহিঙ্গা, দুর্ভাগা সন্তান এক মাতৃহীন-পিতৃহীন– এই পৃথিবীর
পিতা নয়, সত্যকামজননীই শাশ্বত মাতৃত্বে ধন্য চিরকাল।

শিরিন সুলতানার ২টি কবিতা

পল্লবী লীলাবতী

প্রিয়তমা আমার, তোমাকে অভিবাদন জানানোর কোন মুখ আমার আর অবশিষ্ট নাই। তবু একবুক আশা নিয়ে লিখতে বসেছি। ইংরেজি সাহিত্যে, সভ্যতার ঘোড়ার রোগ আর মেজাজের দুরন্ত অহমিকায় তোমার ছোট ছোট ইচ্ছেগুলো খেয়াল করিনি। আমার প্রতি তোমার অনুরাগ শৈশবের ভালবাসা আর তোমার সাথে পুতুল পুতুল খেলার সেই সময়টাও এখন এই আবেগহীন ফ্রান্সের ভার্সাইয়ের রাস্তায় বসে বুঝতে পারছি। ভালবাসার ভাললাগার সব জিনিস আর মানুষকে ফেলে ভিখিরির মত পড়ে আছি এই ফ্রান্সে। অসীম রহস্যঘেরা স্মৃতির প্রদীপ হাতে মাঝরাতে উঁকি দেয় আমার অতীত, গুলিখোর জাতের মত মাতাল হাওয়া দক্ষিণের বারান্দা জুঁড়ে। ঝাপসা হয় মন মহলের বসতচিহ্ন। একাকিত্বের রক্তকোমলও ঝরে পড়ে পূরবীর রাগে। নিজেকে আজকাল ডাস্টবিনের পাশে পড়ে থাকা কংকালসার শিশুও মনে হয়। কি নির্বোধ আমি। হাজার শিল্পের দুঃখ আর ঘৃণার সৌন্দর্যে তৈরি ফ্রান্স আর আমার সাগরদাঁড়ি?? অফুরন্ত ভালবাসায় গড়ে ওঠা। যখন ব্যবধানটা বুঝতে পারলাম তখনই লিখতে বসলাম কপোতাক্ষ নদ আর বীরাঙ্গনা কাব্য। নারী হিসেবে তুমি মন্দ ছিলে না। তবু সাহস করে ভালবাসি শব্দটা বলতে পারোনি। তাইতো শরীর থেকে ঋষিপত্নীর খোলস পরিত্যাগ করে স্বামীর শিষ্যের প্রেমে ঘরছাড়া হতে রাজি করিয়েছি 'তারাদেবীকে' যেখানে আমাদের এই সমকালীন সমাজব্যবস্থায় প্রেম স্বীকৃত না সেখানে পরকীয়া প্রেমকে আশকারা দিয়েছি। বলতে পার শিশুকে পথ বাৎলে দেবার পরিবর্তে সরাসরি ড্রেন লাফ দিয়ে দেখানো। তারা দেবী অনেকটা বেহায়া নির্লজ্জের মত প্রেমিকপুরুষকে মনের কথা জানিয়েছে। ভাবতে পারো কতবড় দুঃসাহস! তারাদেবীকে তৈরি করতে গিয়ে বার বার তোমাকে ভেবেছি। সেদিন তুমি যদি এমন হতে গো সখি আমি কি থাকতাম পরবাসে??

উর্বশী দেবরাজ সুধাপাত্র উপেক্ষা করে সংসার পিঞ্জরে আবদ্ধ হতে চেয়েছিল। তারা আর উর্বশীর নৈতিক চরিত্র নিয়ে তুমি প্রশ্ন তুলতে পার। তবে ভালবাসার কাঙাল হয়ে আমি স্বর্গের বেশ্যাকেও বঞ্চিত করতে চাই না, বিশ্বাস কর। তুমি নারী তোমারও একটা ব্যক্তি-স্বাধীনতা আছে, সেটা কখনও বুঝতে পারোনি। তাইতো রুক্মিণীকে তৈরি করেছি মত প্রকাশে প্রগতিশীল, প্রতিবাদী করে। প্রেম হোক, বিয়ে হোক, কামবাসনা হোক– প্রকাশ করার সাহস থাকতে হবে। আমার মা জাহ্নবীদেবী, যাকে প্রাণাধিক ভালবাসি। কিন্তু যখন আমি ঘর ছেড়ে বাইরে এলাম, বাবা ত্যাজ্য করলেন, তখন মনে মনে চাইতাম তিনি বিদ্রোহী হয়ে উঠুন। তার বদলে মা হয়েছেন স্বামীর বাধ্যগত স্ত্রী। তবে আমার বীরাঙ্গনা জনা আর কৈকেয়ী কেমন বিদ্রোহী দেখ– সন্তান ও অধিকার আদায়ে তৎপর। আমি গোপনে শিখিয়েছি অধিকার আদায়ের কলাকৌশল।

প্রিয়তমা আমার, তোমাকে ভালো না বেসে স্পর্শ না করে অবজ্ঞা করে চলে এলাম তুমি তার কোন অভিযোগ করোনি। তাইতো শকুন্তলাকে সাজিয়েছি। কুমারী মাতা হয়েও হয়েছে অভিযোগের শিকার আর রাজা দুস্মন্ত পুরুষচরিত্রে হয়েছে মতিভ্রম। তাই বলে শকুন্তলা বসে থাকেনি। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক যে শুধু দেহকেন্দ্রিক তা কিন্তু নয়। এটা বোঝার মত মানসিকতা আমার ছিল। নারী অবলা আমাদের সমাজ তাই মনে করলেও আমি কিন্তু মানি না। শুধু পাশ্চাত্যের ভীমরোগে ভুগছিলাম, তুমি একটু শক্ত করে আঁকড়ে ধরতে পারতে... এখন লিখতে বসলে তোমাকে অনুভব করলে আমার হাত কাঁপে, কলম কাঁপে, চোখ ঝাপসা হয়ে ওঠে। অস্থির হয়ে উঠি প্রিয়া হারানোর যাতনায়। শুধরে নিতে ইচ্ছে করে ভুলগুলো। তাই সূর্পণখাকে তৈরি করেছি নির্ভেজাল ভালবাসার আকর করে।

স্ত্রী মানে ভোগের সামগ্রী নয়, স্বামীর যোগ্য পরামর্শক, মঙ্গলময়ীও বটে। তুমি আমার স্ত্রী না হয়েও মঙ্গল চেয়েছ। তাই ভানুমতীকে তোমার সেবার জন্য উৎসর্গ করলাম। মাতৃভক্তি, ধর্মবোধ ও পাঁচস্বামীর ভোগের অন্তরালে দ্রৌপদীকে আরও স্বতন্ত্র করে তুলে এনেছি।

প্রিয়তমা আমার, আদর করে তোমার নাম দিয়েছিলাম কৃষ্ণকুমারী। এই নামটাও হেয়ালীর বশে ছিল। কিন্তু এখন বুঝি ওটা ছিল অবচেতন মনের আরেকটা প্রহসন। ভার্সাইয়ে বসে আজ কেবল বয়স বাড়ছে আর মনে পড়ছে কপোতাক্ষের পাড়ে বেড়ে উঠা ব্রজাঙ্গনা লালনা এই তোমাকেই। মনে পড়ছে আর বুড়ো শালিকের ঘাড়ের রোঁ-এর মত শ্বাস-প্রশ্বাস ওঠানামা করছে। নাড়িছেঁড়া টান অনুভব করি মেঘনাদের তরবারির স্বচ্ছ ধারের মতনএখন। প্রবাসের এই দিনগুলোর সুখে-দুঃখে পাশে পেয়েছি শুধুমাত্র নারী জাগরণের প্রবাদপুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে, যাঁকে বীরাঙ্গনা কাব্যটি উৎসর্গ করেছি।

যাই হোক, তুমি আমার জমিদার বাবার বিলাসবহুল এই অপদার্থকে বলেছিলে মাটি আর সবুজের মত হতে। আজ আমি বিলাতে সম্পূর্ণ একা আর ভিখিরি হয়েছি।

মাতৃভাষা, মাতৃভূমি আর তোমার আত্মবলিদানের কাছে আমি নগণ্য, আমি অনুতপ্ত। নদী ও নারীর কাছে আমি সমাহিত হতে চাই, হতে চাই বলিদান। আমি ফিরতে চাই, ফিরতে চাই কপোতাক্ষের বুকে। আমি আসছি আগামীর ট্রেনে। মোহনবাঁশির মোহনীয় সুর আর রণতুর্যের ঝংকার হাতে নিয়ে, সব অভিযোগের ডালা শূন্য। আমায় গ্রহণ কর, গ্রহণ কর সখি যতনে নিভৃতে তোমার মনের মন্দিরে...।

ইতি

তোমার প্রিয় মধুদা

সোনালি বোতাম

নীরবতার শূন্যপুরাণ ত্যাগ করে
চল আজ শর্তহীন সোনালি বোতাম খুলি
শিল্পের শয়তানকে চিনিয়ে দিই হৃদয়ের ঠিকানা
চেতনার নীল বিষে ডুবে হব পৌরাণিক চাষা
নিঃসঙ্গতাকে বলি দিয়ে সভ্যতার নাগরদোলায় দুলি
দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলি
উদ্দেশ্যহীনভাবে নিরুদ্দেশ হব
পেছনে ফেলে ব্যাথার ভায়োলিন।

সংগীত সংবিৎ

অমৃতের কান্না গীতা দত্ত

ফিরোজ মাহমুদ খান

নিশি রাত বাঁকা চাঁদ আকাশে
চুপি চুপি বাঁশি বাজে বাতাসে...

মাত্র ৪১ বছরের সংক্ষিপ্ত জীবনে– সংগীত সম্রাজ্ঞী লতা মুঙ্গেশকর, আশা ভোঁশলে, গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় প্রমুখ প্রথিতযশা শিল্পীর অপ্রতিদ্বন্দী কণ্ঠস্বর, তাঁদের চোখ ধাঁধানো খ্যাতি আর প্রখর জনপ্রিয়তার মাঝখানেও আপন প্রতিভাগুণে সর্বদা রোমাঞ্চসিক্ত কিন্নরকণ্ঠী প্রতিস্পর্ধীহীন জমিদারনন্দিনী হিন্দি সিনেমার নাইটিঙ্গেল কিংবদন্তী প্লেব্যাক সিঙ্গার আর সোনায় সোহাগা হিসেবে প্রায় পরমা সুন্দরী ও তীক্ষ্ণ মেধার অধিকারিণী সংগীত শিল্পী গীতা দত্তের জীবন সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত বিশ্লেষণকে মাত্র দুটি শব্দে ধরা পড়ে, সে শব্দদুটি হচ্ছে– অমৃতের কান্না। কেবলমাত্র এই শব্দবন্ধ ছাড়া অন্য কোন বিশেষণে বা বিশেষ্যে গীতা ঘোষ রায়চৌধুরী বা গীতা দত্তর তাবৎ নক্ষত্র-সত্তাকে ঠিক ছুঁতে পারা যায় না।

১৯৫৭ সালে গুরু দত্ত তাঁর ছবির নতুন নায়িকা ওয়াহিদা রহমানের দিকে ঝুঁকে পড়েন। এ সময়টিতে নায়িকা ওয়াহিদা রহমানের প্লেব্যাক গানগুলি গাইতেন গীতা দত্ত আর সিনেমায় নায়িকা ওয়াহিদা রহমানের বিপরীতে নায়কের চরিত্রে অভিনয় করতেন গুরু দত্ত। সুতরাং, সহজেই অনুমেয় গীতার তখনকার মানসিক যন্ত্রণা, কেন-না গুরু দত্ত ও ওয়াহিদা রহমানের গোপন প্রণয়ের কথা জানতেন গীতা দত্ত।

১৯৩০ সালের ২৩ নভেম্বর বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার জমিদার দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ রায়চৌধুরী ও শ্রীমতী অমিয়া দেবীর দশ সন্তানের অন্যতম হয়ে জন্ম নেন গীতা। তাঁর বাবা-মা ১৯৪০ সালের প্রথম দিকে কলকাতায় বসবাস শুরু করেন। পরে, কলকাতা থেকে আবার বোম্বের একটি এ্যাপার্টমেন্টে বাসা বাঁধেন গীতার পরিবার; গীতা তখন ১২ বছরের বালিকা, পড়তেন বেঙ্গলি হাই স্কুলে।

কথিত আছে যে, প্রখ্যাত চলচ্চিত্র সংগীত পরিচালক কে হনুমানপ্রসাদ একদিন গীতাদের এ্যাপার্টমেন্টের পাশ দিয়ে যাবার সময় বাসা থেকে আসা গানের আওয়াজে আকৃষ্ট ও মুগ্ধ হন। তিনি গীতাদের বাসায় যান এবং গীতার বাবা-মাকে গীতার কণ্ঠস্বরের অনন্যতা ও অপূর্বতার কথা বলে গীতাকে সংগীত শিক্ষা দিতে তাদের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করেন।

কে হনুমানপ্রসাদ পরিচালিত *ভক্ত প্রহ্লাদ* সিনেমার প্লেব্যাক সিঙ্গার হিসেবে প্রথমবার গীতা ২ লাইন করে বাচ্চাদের গান গাওয়ার সুযোগ পান। গীতা তখন ১৬ বছরের কিশোরী। কিন্নরকণ্ঠী গীতার গাওয়া ঐ ২ লাইনই মাৎ করে দেয় রেকর্ডিং-স্টুডিওর সবাইকে। প্রধানত, ঐ কিশোরী বয়সেই গীতার ছিল সুপরিণত কণ্ঠস্বর, তাতে আবার গাঢ় রোমাঞ্চের সার্বক্ষণিক মিষ্টি আমেজ এবং সর্বোপরি স্বতঃস্ফূর্ত ও সাবলীল অন্তরছোঁয়া স্বর প্রক্ষেপণের যাদু– সব মিলিয়ে গীতার গান স্বতন্ত্র স্বাদে শ্রবণসম্মোহক এক নিবিড় আবেদন ছড়িয়ে দেয় শ্রোতার মনের গভীর থেকে গভীরে। সময় এসেছে, গীতা দত্তর কণ্ঠস্বরের ভাইব্রেশনের মাত্রা ও সৌন্দর্য নিয়ে গবেষণা করে এ ভাললাগার রহস্য উন্মোচনের।

ভক্ত প্রহ্লাদ ছবিতে গীতার গান শুনে সংগীত জগতের কিংবদন্তীপুরুষ শচীন দেববর্মণ রেকর্ডিং স্টুডিও থেকে গীতার ঠিকানা সন্ধান করে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে তাঁর পরিচালিত ছবিতে গান গাওয়ার আমন্ত্রণ জানান। বস্তুত, এস ডি বর্মণই গীতা দত্তকে প্রথম ব্রেকথ্রুটি দেন। আর তাই, মাত্র ১৭ বছর বয়সে গীতা প্লেব্যাক সিঙ্গার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন ও জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন এস ডি বর্মণ পরিচালিত ফিল্মিস্তান-এর *দো ভাই* হিন্দি সিনেমার গান গেয়ে। বিশেষ করে, 'মেরা সুন্দর স্বপ্না বিত্ গ্যায়া' প্লেব্যাক গানটির বিপুল জনপ্রিয়তা ও উত্তুঙ্গ চাহিদার (গানটি রেটিং-চার্টে তখন ছিল ১ নম্বর) ভিতর দিয়ে সংগীতজগতে অরুণোদয় ঘটে গীতা রায়ের।

গীতার কণ্ঠের সজীব আবেশ, রেশমি মধুরিমা, আবেগঘন প্রণোদনা এতই শ্রুতিসুভগ যে, গীতার গান হিন্দি ছাড়াও বাংলা, নেপালি, মৈথিলি, তামিল প্রভৃতি ভাষার শ্রোতাকেও খুব দ্রুত আকৃষ্ট ও মুগ্ধ করে। গীতার কণ্ঠের আরেকটি বিশেষত্ব এই যে, গীতা সব ধরনের গান একেবারে সাবলীল গাইতে পারেন, হোক সেটি ভজন, কীর্তন কিংবা আধুনিক গান অথবা নাইট ক্লাবের ক্যাবারে ডান্সের গান। এ প্রসঙ্গে হিন্দি ছবির ক্যাবারে ডান্সের গান 'মেরা নাম চিন্ চিন্ চিন্'-এর পাশে বাংলা সিনেমার হার্টথ্রব সুচিত্রা সেন এবং মহানায়ক উত্তমকুমার অভিনীত অবিস্মরণীয় ছবি *হারানো সুর*-এ সুচিত্রা সেনের প্লেব্যাক সিঙ্গার হিসেবে গাওয়া 'তুমি যে আমার, ওগো তুমি যে আমার' গানটি শুনলে বিষয়টি খুব সহজে নজরে আসবে।

১৯৪৭ থেকে ১৯৪৯ পর্যন্ত গীতা দত্ত ছিলেন মুম্বই ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির ১ নম্বর প্লেব্যাক সিঙ্গার যার শনৈঃ শনৈঃ উত্তরণ তখন তাক্ লাগিয়ে দিয়েছিল সংগীত জগতের সবাইকে। ১৯৫১ সালের দিকে গীতা ভজন, কীর্তন ও দুঃখের গানের জন্যে বিপুল পরিচিতি লাভ করেন।

১৯৫১ সালে *বাজি* সিনেমার গান রেকর্ডিংকালে গীতা রায়ের সঙ্গে পরিচয় ঘটে উদীয়মান তরুণ পরিচালক গুরু দত্তের। গভীর প্রেমে পড়েন দুই মেধাবী শিল্পী একে অন্যের। গীতা ও গুরু দত্তের রোমান্টিক প্রেমের সম্পর্ক সোনায় সোহাগা বিবাহবন্ধনে পরিণতি লাভ করে ১৯৫৩ সালের ২৬ মে। গীতা তাঁর শ্রেষ্ঠতম গানগুলি তাঁর প্রেমিকপুরুষ ও স্বামী গুরু দত্তের ছবিগুলিতেই গেয়েছেন অন্যান্য সব বাণিজ্যিক গানের ব্যস্ততার মাঝেও। এ বিষয়ে গাঢ় বেদনার কিছু ইতিহাস আছে যা পরিণামে গীতার শিল্পীজীবন ও ব্যক্তিজীবন বিপর্যস্ত করেছে, যেখান থেকে আর কখনোই ফিরে আসতে পারেননি এই ক্ষণজন্মা অপূর্ব কণ্ঠসম্পদের অধিকারিণী গায়িকা।

১৯৫৭ সালে গুরু দত্ত তাঁর ছবির নতুন নায়িকা ওয়াহিদা রহমানের দিকে ঝুঁকে পড়েন। এ সময়টিতে নায়িকা ওয়াহিদা রহমানের প্লেব্যাক গানগুলি গাইতেন গীতা দত্ত আর সিনেমায় নায়িকা ওয়াহিদা রহমানের বিপরীতে নায়কের চরিত্রে অভিনয় করতেন গুরু দত্ত। সুতরাং, সহজেই অনুমেয় গীতার তখনকার মানসিক যন্ত্রণা, কেন-না গুরু দত্ত ও ওয়াহিদা রহমানের গোপন প্রণয়ের কথা জানতেন গীতা দত্ত।

১৯৬৪ সালের ১০ অক্টোবর গুরু দত্ত লোকান্তরিত হলে গুরু দত্ত ও গান– দুই-ই হারিয়ে যায় গীতার জীবন থেকে। গীতার নার্ভাস ব্রেকডাউন ঘটে এবং শিল্পীজীবন থেকে তিনি সরে থাকেন দীর্ঘদিন। সুস্থ হবার পর গীতা দত্ত প্রচণ্ড আর্থিক কষ্টে পড়েন। এ কারণে তিনি দুর্গাপূজার গান এবং স্টেজ পারফরমেন্স করেন। গীতা এ সময় *বধুবরণ* বাংলা সিনেমায় নায়িকার চরিত্রে অভিনয় করেন, বলা বাহুল্য, নায়িকার প্লেব্যাক কণ্ঠও তাঁরই এবং বাংলা ছবি *অনুভব*-এর প্লেব্যাক সিঙ্গার হিসেবেও গান করেন এ সময়।

নচিকেতা ঘোষের সুরে তাঁর পরিচালিত *পৃথিবী আমারে চায়* বাংলা সিনেমায় গীতা দত্ত গেয়েছেন বিখ্যাত সেই গানটি– 'নিশি রাত বাঁকা চাঁদ আকাশে/ চুপি চুপি বাঁশি বাজে বাতাসে', আর হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে গেয়েছেন– 'নীড় ছোট ক্ষতি নেই, আকাশ তো বড়'-র মত অবিস্মরণীয় সব বাংলা গান। মোহম্মদ রফি, তালাত মাহমুদ, লতা, সামশাদ বেগম প্রমুখ অনেক বিখ্যাত শিল্পীর সঙ্গে ডুয়েট গেয়েছেন গীতা।

একটা কথা না বললেই নয়, গীতার সমসাময়িক সতীর্থ ও প্রতিদ্বন্দ্বী সব বিখ্যাত শিল্পীর মধ্যে গীতা দত্তর সংগীত-প্রশিক্ষণ ও অনুশীলন ছিল সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত। কিন্তু প্রশিক্ষণ ও অনুশীলনের যে মুখ্য উদ্দেশ্য, গীতা দত্ত তার চেয়েও বেশি গানোপযোগী তাৎক্ষণিক ট্রিটমেন্ট দিতে পারতেন তার যে কোন গাওয়া গানে। একজন প্রখ্যাত সংগীত সমালোচকের মন্তব্য– গীতা দত্ত আসলে গান করেন না, গানের সুরে নিজেকে ভাসিয়ে দেন।

বারশোর ওপরে হিন্দি গান গেয়েছেন গীতা দত্ত। বাংলা গান গেয়েছেন যদিও-বা একেবারেই মুষ্টিমেয়; কিন্তু, অঙ্গুলিমেয় সে অতিপরিচিত ও অতিশ্রুত গীতিমাধুর্যের অপূর্ব গভীর মূর্ছনাতেই ঝংকৃত হয়ে চলেছে বাঙালিজীবনের প্রজন্মের পর প্রজন্মের সুখদ স্বপ্নময় ঐতিহ্যিক ভাল লাগা।

দুই ছেলে তরুণ ও অরুণ আর এক মেয়ে নীনা– গীতা-গুরু দত্তের তিন সন্তান। ১৯৭২ সালের ২০ জুলাই লিভার সিরোসিসে আক্রান্ত হয়ে এই অলোকসামান্য কিন্নরকণ্ঠী গায়িকা স্বর্গগামিনী হন।

ফিরোজ মাহমুদ খান
প্রাবন্ধিক, সরকারি কর্মকর্তা

যোগ

দিল্লিতে তৃতীয় বিশ্ব যোগ সম্মেলনে

মুহাম্মদ হারুন

'ইয়োগা ফর ওয়েলনেস'– এই স্লোগানকে সামনে রেখে এবছরের ১০-১১ অক্টোবর নতুন দিল্লিতে ভারত সরকারের আয়ুশ মন্ত্রকের ব্যবস্থাপনায় পাঁচশোর অধিক বিশিষ্ট ব্যক্তি, যোগ ও সহযোগবিজ্ঞান বিশেষজ্ঞ এবং আশিজন বিদেশী প্রতিনিধির অংশগ্রহণে শেষ হয় তৃতীয় আন্তর্জাতিক যোগ সম্মেলন।

প্রাচীনকালে যোগ একটি আধ্যাত্মিক বিষয় হিসেবে বিবেচিত হলেও কালের বিবর্তনে এখন যোগের ব্যাপ্তি অনেক। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদির আন্তরিক প্রচেষ্টায় জাতিসংঘ ২১ জুনকে 'বিশ্ব যোগ দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার ফলে যোগের ব্যাপকতা, গ্রহণযোগ্যতা ও প্রয়োজনীয়তা প্রকাশ পেয়েছে যা এখন 'সকলের জন্য যোগ' হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

প্রথম আন্তর্জাতিক যোগ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ২০১৫ সালের ২১ ও ২২ জুন নতুন দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে ১৩০০ ভারতীয় এবং বিদেশী ডেলিগেটের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে যার স্লোগান ছিল 'ইয়োগা ফর হলিস্টিক হেলথ্'।

২০১৬ সালের ২১-২২ জুন দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক যোগ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় 'ইয়োগা ফর বডি এন্ড বিয়ন্ড' স্লোগানকে সামনে রেখে। এটিও নতুন দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। এতে অংশগ্রহণ করেন প্রায় ১০০০জনের বেশি বিশেষজ্ঞ, বিশিষ্ট ব্যক্তি ও বিদেশী প্রতিনিধি।

আয়ুশ মন্ত্রকের ব্যবস্থাপনায় নতুন দিল্লির চানক্যপুরীর প্রবাসী ভারতীয় কেন্দ্রে আয়োজিত তৃতীয় আন্তর্জাতিক যোগ সম্মেলনে পাঁচশোর বেশি ভারতীয় এবং ৮০জন বিদেশী প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

শাব্দিক অর্থে 'ওয়েলনেস' বলতে শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক ও সমাজের কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডকে বোঝায়। কিন্তু বিস্তৃত অর্থে 'ওয়েলনেস' বলতে একজন মানুষের সামগ্রিক লাইফস্টাইল, যার মাধ্যমে অসুস্থতা থেকে মুক্ত হয়ে অধিক সুস্থতার সঙ্গে বেঁচে থাকার পাশাপাশি দেশ ও জাতির উন্নয়নে ভূমিকা রাখাকে বোঝায়।

আন্তর্জাতিক যোগ সম্মেলনে অনেকগুলো উপবিভাগে কারিগরি সেশন অনুষ্ঠিত হয়। এগুলো হচ্ছে: ইয়োগা ফর ওয়েলনেস: রিসেন্ট ট্রেন্ডস্; ইয়োগা এন্ড নন কমিউনিকেবল ডিজিস্: এ রিসার্চ ওভারভিউ; ইয়োগা এন্ড ইন্টেগ্রেটেড মেডিসিন; ইয়োগা ফর ক্যান্সার কন্ট্রোল; ইয়োগা ফর ডিপ্রেশন; ইয়োগা ফর ওম্যান: কেস স্ট্যাডিজ অন গয়েনোকোলজিক্যাল ডিসওর্ডারস্ এবং ইয়োগা ফর পেইন ম্যানেজমেন্ট। একটি প্যানেল আলোচনার মধ্য দিয়ে সম্মেলন শেষ হয়।

সম্মেলনে ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকার সুপারিশ এবং ভারতের আয়ুশ মন্ত্রকের আমন্ত্রণে বাংলাদেশ থেকে চারজন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। হাবিবা ইউসুফ শিখা, রুবা মজুমদার ও আশিস অধিকারীর সঙ্গে এ নিবন্ধের লেখকও আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন।

ভারত সরকারের আতিথেয়তা, সহযোগিতা, আধুনিক ব্যবস্থাপনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আমাদের মুগ্ধ করে, যা নিঃসন্দেহে প্রসংশার দাবিদার।

সম্মেলনে যোগ আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে কত বড় ভূমিকা রাখতে পারে তা যুক্তিসঙ্গত ও বিজ্ঞানসম্মতভাবে উপস্থাপন করা হয়। শুধু তাই নয়, কিভাবে ইয়োগাকে শিক্ষাগত ব্যবস্থায় এনে মানবকল্যাণে ব্যবহারের মাধ্যমে একটি সুস্থ ও সুন্দর জাতি গড়ে তোলা যায় তার পথনির্দেশ দেওয়া হয়। সম্মেলনে এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের আন্তরিকতা ও বন্ধুত্ব সৃষ্টির মাধ্যমে একটি সুস্থ ও সুন্দর পৃথিবী গড়ে তোলার আহ্বানও প্রকটিত হয়।

ভারতের আয়ুশ মন্ত্রকের এ ধরনের আয়োজনে আমরা আনন্দিত ও কৃতজ্ঞ। ভবিষ্যতে এ ধরনের আয়োজনের পাশাপাশি যোগ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে এবং যোগের প্রচার-প্রসারে বাংলাদেশে আয়ুশের মত একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা অপরিহার্য বলে আমরা মনে করি।

সম্মেলনে যোগ আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে কত বড় ভূমিকা রাখতে পারে তা যুক্তিসঙ্গত ও বিজ্ঞানসম্মতভাবে উপস্থাপন করা হয়। শুধু তাই নয়, কিভাবে ইয়োগাকে শিক্ষাগত ব্যবস্থায় এনে মানবকল্যাণে ব্যবহারের মাধ্যমে একটি সুস্থ ও সুন্দর জাতি গড়ে তোলা যায় তার পথ নির্দেশ দেওয়া হয়।

মুহাম্মদ হারুন যোগ প্রশিক্ষক
প্রতিষ্ঠাতা যুগ্ম-সম্পাদক, বাংলাদেশ ইয়োগা এসোসিয়েশন

বাংলাদেশী শিক্ষার্থীদের জন্য ভারত সরকারের স্কলারশিপসমূহ

প্রতি বছর ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশন ভারত ও বাংলাদেশে পড়ালেখার জন্য বিভিন্ন স্কিমে বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের জন্য বিপুলসংখ্যক স্কলারশিপ প্রদান করে থাকে। এগুলি নিম্নরূপ:

১. আইসিসিআর স্কলারশিপসমূহ

ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেসন্স (আইসিসিআর) ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা কোর্স গ্রহণে নিম্নোক্ত স্কলারশিপসমূহ প্রদান করে:

ক. ইন্ডিয়া স্কলারশিপ স্কিম;
খ. বাংলাদেশ স্কলারশিপ স্কিম;
গ. সার্ক স্কলারশিপ স্কিম;
ঘ. কমনওয়েলথ স্কলারশিপ স্কিম; এবং
ঙ. আয়ুশ স্কলারশিপ স্কিম।

ইন্ডিয়া স্কলারশিপ স্কিম

যুব বিশেষত বাংলাদেশের তরুণ শিক্ষার্থী বিনিময় বৃদ্ধির ভারতীয় প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং ২০১১ সালের সেপ্টেম্বরে ঢাকা সফরকালে মর্যাদাপূর্ণ ইন্ডিয়া স্কলারশিপ স্কিম ঘোষণা করেন। সেই সূত্রে আইসিসিআর ২০১২-১৩ শিক্ষাবর্ষে স্কিমটি প্রবর্তন করে। এ বৃত্তির আওতায় শিক্ষার্থীরা মানবিক, বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে স্নাতক/স্নাতকোত্তর/পিএইচ ডি কোর্স (ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেডিসিন ছাড়া)-এ ভারতে অধ্যয়ন করতে পারেন।

বাংলাদেশ স্কলারশিপ স্কিম

এ স্কিমের আওতায় আইসিসিআর প্রতি বছর প্রকৌশল, বিজ্ঞান, বাণিজ্য, ব্যবস্থাপনা, ফার্মাসি, চারুকলা ও চিরায়ত ভারতীয় ভাষাসমূহ অধ্যয়নে স্নাতক/স্নাতকোত্তর/এম ফিল/পিএইচ ডি/পোস্ট ডক্টরাল কোর্সে (মেডিসিন ছাড়া) শিক্ষার্থীদের স্কলারশিপ প্রদান করে থাকে।

সার্ক স্কলারশিপ স্কিম

এ স্কিমের আওতায় আইসিসিআর স্নাতক/স্নাতকোত্তর/ এম ফিল/ পিএইচডি (মেডিসিন ছাড়া) কোর্সে স্কলারশিপ প্রদান করে থাকে।

কমনওয়েলথ স্কলারশিপ স্কিম

এ স্কিমের আওতায় আইসিসিআর স্নাতক/স্নাতকোত্তর/এম ফিল/পিএইচ ডি/পোস্ট ডক্টরাল কোর্সে (মেডিসিন ছাড়া) স্কলারশিপ প্রদান করে থাকে।

উপরোক্ত ক-ঘ স্কিমগুলির জন্য সাধারণত ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে বাংলাদেশের প্রধান প্রধান সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দানের মাধ্যমে দরখাস্ত আহ্বান করা হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা আরো তথ্যের জন্য ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশনের ওয়েবসাইট ভিজিট করতে পারেন: www.hcidhaka.gov.in

আয়ুশ স্কলারশিপ স্কিম

প্রতি বছর ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশন ভারতের ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসা ব্যবস্থা যেমন আয়ুর্বেদ, ইউনানি, সিদ্ধ ও হোমিওপ্যাথি কোর্সে অধ্যয়নের জন্য আইসিসিআর-এর এ কোর্সের জন্য স্কলারশিপ নির্বাচন সমন্বয় করে থাকে। স্কিমটি সাধারণত জুলাই মাসে ঘোষণা করা হয়।

ভারতীয় শিক্ষাবৃত্তি ২০১৭-১৮

আবেদনকারীদের বিপুল সাড়া এবং আগ্রহের প্রেক্ষিতে ভারতীয় হাই কমিশন আইসিসিআর শিক্ষা বৃত্তি ২০১৭-২০১৮-এর আবেদনের শেষ তারিখ ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ থেকে ০৩ জানুয়ারি ২০১৭ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়।

শিক্ষাবৃত্তির জন্য বিস্তারিত তথ্য/দিক নির্দেশনাসহ আবেদনপত্র ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকার এই লিঙ্ক http://www.hcidhaka.gov.in/pages.php?id=19741-এ দেওয়া হয়েছিল। প্রার্থীকে এই লিঙ্ক থেকে আবেদন পত্র ডাউনলোড এবং পূরণ (টাইপ করা হতে হবে, হাতে লেখা গ্রহণযোগ্য নয়) করতে বলা হয়েছিল। আবেদনপত্রে ছবি স্ক্যান করে সংযুক্ত করে এবং স্বাক্ষর (হাতে লিখে স্ক্যানকৃত স্বাক্ষর) ও তথ্যাদিসহ আবেদনপত্রটি পিডিএফ ফরম্যাটে তৈরি করে প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্রসহ নিচে উল্লেখিত যে কোন ঠিকানায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আবেদনপত্রসমূহের গ্রহণযোগ্যতা পরিমাপের জন্য এবং পরবর্তীতে ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা পরীক্ষার করার জন্য ই-মেইল করতে বলা হয়:

ক. ভারতীয় হাই কমিশন,ঢাকা: attedu@hcidhaka.gov.in
খ. সহকারী ভারতীয় হাই কমিশন, চট্টগ্রাম: ahc@colbd.net
গ. সহকারী ভারতীয় হাই কমিশন, রাজশাহী: ahc.rajshahi@mea.gov.in

যোগ্য বিবেচিত প্রার্থীদের ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা পরীক্ষা (ইপিটি) অনুষ্ঠিত হয় ১৩ জানুয়ারি ২০১৭। এবছর ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে রেকর্ডসংখ্যক ১৭২১ জন শিক্ষার্থী ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেসন্স-এর আইসিসিআর স্কলারশিপ ২০১৭-র পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। আবেদনের জন্য বিজ্ঞপ্তি, আবেদনের শেষ সময়, যোগাযোগের পূর্ণ ঠিকানা ইত্যাদি ফেসবুকের এই পেজসহ বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচার করা হয়।

• বিজ্ঞপ্তি

ছোটগল্প

অমীমাংসিত

খোরশেদ বাহার

হাকিম সাহেব প্রতিদিন খুব ভোরে একবার বাড়ির ছাদে যান। তখনও সূর্যের আলো মাটিতে পড়েনি। বাড়ির সবাই তখনও দিব্যি আয়েশ করে ঘুমিয়ে থাকে। চুপি চুপি দোতলার সিঁড়ি মাড়িয়ে তিনি উঠে আসেন ছাদে। লেকের ধারে সবুজ গাছগাছালির ফাঁকে ফাঁকে কুয়াশা আর দিনের আলোর মাখামাখিতে তার মন বেশ প্রফুল্ল থাকে। শীতের দিনে আর চৈত্রের গরমে পাতা ঝরার নীরব গান তিনি বেশ মন দিয়ে উপভোগ করেন।

সূর্য উঠি উঠি করছে। গাছের সারিতে চোখ বুলিয়ে নেন হাকিম সাহেব। লম্বা শ্বাস নেন ফুসফুস ভরে। সারা রাতের আড়ষ্টতা কাটিয়ে উঠতে হাত-পা ছোড়াছুড়ি করেন দিকবিদিক। এই সময়টাতে ছাদে আর কেউ যায় না। ভদ্রলোকের শরীর একটু ভারি হলেও সুগারের সমস্যা নেই। সুঠাম দেহ। সুনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন। ছাদে ফুলের টব রেখেছেন অনেকগুলো। একটা কাগজিলেবুর গাছও রেখেছেন। লেবুফুলের গন্ধ তার খুব প্রিয়। নিজের হাতে রোজ সকালে গাছগুলোতে পানি দেন, আগাছা পরিষ্কার করেন। মাঝে-মধ্যে বাড়তি ডালগুলো ছেটে দেন। নিজের মত করে সাজিয়ে রাখতে জান ছোট্ট বাগানটিকে।

হেনা বেগম হাকিম সাহেবের স্ত্রী। একসঙ্গে সংসারের ঘানি টানছেন দু'জন। ইদানীং মনে হয় তিনি বড় বেশি ক্লান্ত। এ ক্লান্তি কতটুকু শরীরের আর কতটুকু মনের এ নিয়ে অবশ্য হাকিম সাহেবের বেশ কসফিউশন আছে। এই যে প্রতিদিন ঘণ্টাখানেক সময় হাকিম সাহেব নিজের মত কাটান তার জন্য চরম মূল্য দিতে হয় তাকে।

এতক্ষণে সূর্যের কমলা রোদ এসে গায়ে লেগেছে হাকিম সাহেবের। নিজের জন্য খেটেছেন অনেক। নিজের শরীরের জন্য মনের জন্য। এখন ধীরে ধীরে নিচে নেমে আসছেন তিনি। নিশ্চয় এতক্ষণে সবাই ঘুম থেকে উঠে যে যার মত তৈরি হচ্ছে দিনের কাজের জন্য। কলিং বেল চাপবার আগে একটু থামলেন তিনি।

হেনা বেগম হাকিম সাহেবের স্ত্রী। একসঙ্গে সংসারের ঘানি টানছেন দু'জন। ইদানীং মনে হয় তিনি বড় বেশি ক্লান্ত। এ ক্লান্তি কতটুকু শরীরের আর কতটুকু মনের এ নিয়ে অবশ্য হাকিম সাহেবের বেশ কসফিউশন আছে। এই যে প্রতিদিন ঘণ্টাখানেক সময় হাকিম সাহেব নিজের মত কাটান তার জন্য চরম মূল্য দিতে হয় তাকে। কিন্তু কী করবেন বেচারা! তাই প্রতিদিনের মত আজকেও ছাদ থেকে নেমে কানে তুলো গুঁজে সোজা চলে যান ওয়াশরুমে। যদিও এমন পলায়নপর মানসিকতা তিনি রপ্ত করেছেন বেশ পরে। জীবনের অনেকটা দিন এক রহস্যময় গোলকের মত করে শুধু ঘুরপাক খেয়েছেন সংসারের ঘেরাটোপে। কিনারা করতে পারেননি কিছুর। অবশেষে আবিষ্কার করেছেন শান্তি লাভের এই নির্মোহ পথ। দেখবে শুনবে বলবে না, কোনও বিপদেও পড়বে না।

দরজায় ঢং করে বেল বাজতেই দ্বিগুণ জোরে বেজে ওঠে হেনা বেগমের গলা,

– হল? বৃক্ষপ্রেম শেষ? বলি ওই গাছটা যে এবার ছাদটাকে ফুটো করতে চলেছে তা কি চোখে পড়ল নাকি সেটাতেও ঢেলে দিয়ে আসলে দু'মগ?

হাকিম সাহেব ততক্ষণে বেশ চাপ অনুভব করছেন। কোনও দিকে না তাকিয়ে সোজা টয়লেটে ঢুকলেন। গিন্নির চেঁচামেচিতে ছেলেমেয়ে দুটো যে যার ঘরে কাঁথা টেনে মাথা ঢেকে নিল। মেয়ে নীরা ঘুমজড়ানো চোখে দেয়াল ঘড়িতে দেখে মাত্র সকাল ছ'টা।

দরজায় আবার ঢং করে বেল বেজে ওঠে। যথারীতি হেনা বেগম চেঁচাতে চেঁচাতে এগিয়ে গেলেন,

– এই তোমার আসার সময় হল? দেখেছ ক'টা বাজে? আজকে কেন দেরি হল, একটু বল তো বুয়া?

বুয়া নূরজাহান প্রতিদিন একই কথা শুনছে। আধা ঘণ্টা আগে এলেও যা পরে এলেও তা। একটা ভাঙা ক্যাসেটের মত একই সুর প্রতিদিন। কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে জোরে জোরে রাতের বাসি বাসনপত্র মাজতে শুরু করে সে।

– বলি কী বুয়া একটু শব্দ কম করলে ভাল হয়। আজ সকালে নাস্তায় দশটা রুটি সাথে আলু ভাজি। বেশি কিছু করে নষ্ট কোরো না কিন্তু। কাপড়-চোপড়গুলো বালতিতে আগেই ভিজিয়ে রাখা আছে, একটু কেচে ছাদে দেবে। দেখো আবার চুরি না হয়। আর হ্যাঁ, চায়ের পানি বসাও। তোমার খালু বের হয়েই চা চাইবে বুঝেছ? ওনার তো আবার সকালে আল্লা খোদার নাম নাই, আছে ছাদের কয়খানা টব। এবার যদি আমি গাছগুলো উপড়ে না ফেলি তবে আর কী বলেছি!

– কাঁচামরিচ নাই, সবজি করব কী দিয়ে?

– তা থাকবে কেন? রাস্তার মোড়ে সকালে কী সুন্দর বাজার। কতলোক মর্নিং ওয়াক শেষে বাসায় ফেরার পথে তাজা সবজি-মাছ কিনে আনে আর আমাদের উনি যান ছাদে। তুমি একটু দৌড় দিয়ে যাও, গিয়ে নিয়ে আস।

বুয়া হাতের কাজ ফেলে মরিচ আনতে যায়।

বাথরুমের দরজায় কড়া নাড়েন হেনা বেগম।

– কি তোমার হল? বাপ রে বাপ। বাথরুমে পুরুষ মানুষের এত সময় লাগে?

ভেতরে হাকিম সাহেব জোরে জোরে শব্দ করে গারগল করতে থাকেন। হাকিম সাহেবের আরও সময় লাগে। ছাদের এক ঘণ্টার পর ওয়াশরুমে আরেক ঘণ্টা। নিত্যদিনের বাঁধা রুটিন। আর বাইরে থেকে সাতসকালে হেনা বেগমের চেঁচামেচি– তাও প্রতিদিনের রুটিনের অংশ। তিনি বের হবেন ঠিক সাতটায়।

দরজায় আবার ঢং করে বেল বাজে। নূরজাহান মরিচ নিয়ে ফিরেছে।

– আচ্ছা বুয়া এত সময় লাগে এইটুকু পথ আসতে যেতে? তুমি আর কোথায় কোথায় গিয়েছিলে বল তো?

বুয়া চুপ।

– যাক বাবা তুমি গোল্লায় যাও কিন্তু ফ্রিজে যে ডিম নাই তা কী তোমার চোখে পড়ল না? এখন ছেলেটা নাস্তা খাবে কী করে? যাও মরিচ রাখ।

– খালাম্মা আপনি তো আলু ভাজির কথা বললেন।

– গাধা, তুমি কী জান না, নীরব সকালে এগুলো কিছুই খেতে পারে না। তার জন্য তো ডিম লাগবেই।

– খালাম্মা আজ থাক।

– না, কথার ওপর কথা একদম বন্ধ।

বুয়া চটে যায়। এইসব আমারে দিয়ে করান ক্যান? আপনেরা আইনে রাখতে পারেন না? আমার কী বাজার করার কথা? না পারুম না।

– বুয়া তোমার এত সাহস? তুমি আমাকে হুমকি দাও? বলছি যাও। টাকা নাও ডিম নিয়ে আস। সবজি আমি দেখছি।

বুয়া আবার ডিম কিনতে বেরিয়ে পড়ে। হেনা বিবির মাথা আজ বিগড়ে গেছে। বুয়ার পাল্টা কথায় তার প্রেশার বেড়ে গেছে। বেডরুমের খাটে বসেন আছে ফ্যান ছেড়ে দিয়ে। রান্নাঘরে আলু ভাজি থাকে পড়ে।

নীরবের ঘুম ভাঙল এইমাত্র। সমস্ত বাড়ি শুনসান। কারো মুখে কথা নেই। নীরা মায়ের রুমে উঁকি দিয়ে আবার তার ঘরে ঢুকে দরজা লক করে দেয়। বেরিয়ে আসে ঠিক সাড়ে সাতটায়। নাস্তার টেবিল ফাঁকা। এক গ্লাস পানি খায় তারপর ঝিম মেরে বসে থাকে বাবার জন্য অপেক্ষা করে। চুল মুছতে মুছতে বেরিয়ে আসেন তিনি। দূর থেকেই তিনি সব বুঝে যান।

– নীরা মা রেডি?

– হ্যাঁ বাবা, চল।

– বুয়া এখনও ফিরছে না কেন? আর আমি পারি না। সেই কখন গেছে, এখনও ফিরছে না। ওনাকে যে কিছু বলব সকালে সে জোটি নেই। সকাল হলেই ছাদে যাওয়া, সংসারের খবর কিছু রাখ? বৃক্ষপ্রেম? ঘরের কী খবর সে দিকে যদি একটু নজর থাকত তাহলে আমি একটু শান্তি পেতাম। উনি আছেন গাছ নিয়ে। বলি, ওগুলো দিয়ে কী হবে? টনটনে কয়টা গোলাপের গাছ ছাড়া আর কিছু তো নেই। তাও ফুল ফুটতে দেখিনি কখনও। যাক বাপু যা খুশি কর, আমি বলে বলে হয়রান।

দরজায় আবার বেল বাজে।

– বুয়া এসেছে। দরজা খোল নীরা।

– মা, পেপারওয়ালা।

– তো দরজা বন্ধ কর। দাঁড়িয়ে আছ কেন?

– এ মাসের বিল চাইছে।

– বল, কাল নিতে।

নীরা স্কুলের ব্যাগ পিঠে নিয়ে বাবার পিছু নেয়। আবার ঢং করে বেল

নীরা চুপ করে থাকে। স্কুলের গেটে চলে এসেছে দু'জন। মেয়ে নেমে পড়ে। একই রিক্সায় উল্টো পথে বাসায় ফিরে আসেন হাকিম সাহেব। ফিরবার পথে অনেককিছু ভাবতে থাকেন। কী ভয়ানক হিংসুটে মেয়েরে বাবা! বড় হোক গাছটা তখন না হয় দেখা যাবে। এখনই সে ছাদ ফুটো করে তো বাড়িঘর সব ভেঙে দিচ্ছে না।

বাজে। হেনা বেগম নীরাকে দরজা খুলতে বলেন। দরজা খোলাই ছিল। বুয়া ডিম নিয়ে রান্না ঘরে ঢুকে পড়ে।

– তোমার এত দেরি বুয়া। তাড়াতাড়ি ডিমটা ভেজে টেবিলে দাও। নীরার দেরি হচ্ছে।

– খালাম্মা নীরা আপু আর খালু তো বেরিয়ে গেছে।

– জিদ দেখেছ এইটুকু মেয়ের? বাবা মেয়ে দু'জনেই একইরকম। লাই দিয়ে দিয়ে মেয়েটাকে একদম নষ্ট করে ফেলেছে। দু'মিনিট দেরি করে গেলে কী এমন হত? ক্লাসে দেরি হয় না? রাস্তাঘাটে জ্যাম হয় না? তাই বলে নাস্তা না খেয়েই ওইটুকু বাচ্চাকে নিয়ে কী করে সে নিয়ে যায়? ফিরতে দাও আজকে। আর ভাল লাগে না। বুয়া তুমি নাস্তা রেডি করে টেবিলে দিয়ে অন্য কাজে যাও।

বাবা-মেয়ে দু'জনে রিক্সায় বসে। অল্প দূরেই স্কুল। কিন্তু বেশ জ্যাম।

– তুমি কী খাবে এখন? কখন ছুটি হবে?

– আমার ঘরে বিস্কুট ছিল। খেয়ে নিয়েছি। আমি জানি আজ নাস্তা দেরি হবে। টিফিন স্কুলে করে নেব। টাকা আছে। আচ্ছা, বাবা ছাদের কোন গাছটা ঘরের ছাদ ফুটো করে ফেলেছে? তুমি দেখেছ?

হাকিম সাহেব জবাব দেন না। পাল্টা প্রশ্ন করেন মেয়ের কাছে,

– আচ্ছা, মা মাটি ছাড়া কী গাছ হয়? ইট-পাথরের দেয়ালে কী গাছের শিকড় গজাতে পারে? তুমি কী ছাদের সে গাছটা দেখেছ?

নীরা চুপ করে থাকে। স্কুলের গেটে চলে এসেছে দু'জন। মেয়ে নেমে পড়ে। একই রিক্সায় উল্টো পথে বাসায় ফিরে আসেন হাকিম সাহেব। ফিরবার পথে অনেককিছু ভাবতে থাকেন। কী ভয়ানক হিংসুটে মেয়েরে বাবা! বড় হোক গাছটা তখন না হয় দেখা যাবে। এখনই সে ছাদ ফুটো করে তো বাড়িঘর সব ভেঙে দিচ্ছে না। কিন্তু না। এই গাছ এখন তার জন্মের শত্রু। ওটাকে ওপড়াও তারপর অন্য কথা। ভীষণ জেদ হয় হাকিম সাহেবের। মনে মনে তিনিও প্রতিজ্ঞা করে বসেন, প্রয়োজনে সংসারের সব অশান্তি অঘটন তিনি মাথায় পেতে নেবেন কিন্তু ঐ গাছের কোনও অনিষ্ট তিনি মানবেন না। ভেতরে ভেতরে স্ত্রীর ওপর ভীষণ সন্দেহপ্রবণ হয়ে ওঠেন তিনি। বাসায় ফিরেই আবার ছাদে যান। না জানি এই ফাঁকেই গাছটা উপড়ে ফেলেছেন কি না হেনা বেগম। ছাদে গিয়ে দেখেন, গাছটি যথাস্থানেই আছে। স্বস্তি নিয়ে বাসার ভেতরে ঢুকে তিনি অফিসের জন্য তৈরি হতে থাকেন।

হেনা বেগম এখন চুপচাপ। কালবোশেখী ঝড়ের শেষে সব যেমন ঠাণ্ডা হয়– অনেকটা সেরকম।

নাস্তার টেবিলে বসেছেন হাকিম সাহেব। রুটি ভাজি যা হয় কিছু একটা খেয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাচ্ছিলেন অফিসে। হঠাৎ ল্যান্ডফোন বেজে উঠল। হেনা বেগম ধরলেন।

– হ্যাঁ, আজিম ভাই বলেন। হ্যালো হ্যালো...।

কোনও কথা বলছে না। কান্নার শব্দ।

– একটু তুমি ধরবে ফোনটা, বলে হাকিম সাহেবের দিকে রিসিভার এগিয়ে দিলেন।

– হ্যাঁ, আমাকেই দাও।

– হ্যালো আজিম। কী খবর? ভাবীর খবর কী?

– দোস্ত এইমাত্র তোর ভাবী চলে গেলেন আমাকে ছেড়ে, ফাহিমকে ছেড়ে।

– তা ওখানে আর কে আছে?

– বাড়ি থেকে ছোটভাই আর তার বউ এসেছিল। আমরা এই ক'জনই এখানে। কিছুক্ষণের মধ্যেই লাশ নিয়ে গ্রামের দিকে রওনা দেব। তোকে খবরটা জানালাম। পারলে একবার গ্রামে আসিস।

হাকিম সাহেবের দূর সম্পর্কের ভাই আজিম। একই গ্রামে বাড়ি। বাল্যবন্ধুও বটে। বেশ কিছুদিন হল বেচারার স্ত্রী হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। কী করা উচিত বুঝে উঠতে পারছেন না হাকিম সাহেব। সোফায় বসে পড়লেন। আবার এক গ্লাস পানি চাইতে গিয়ে থেমে গেলেন। নিজেই টেবিলে রাখা বোতল থেকে এক গ্লাস পানি ঢেলে নিলেন।

তীর্যক চোখে দেখলেন হেনা। জড়তা ভেঙে হেনা বলে উঠলেন,

– যাও না একবার হাসপাতালে। একদিন অফিস মিস করলে কী আর এমন হবে! বেচারাদের এই দুর্দিনে পাশে না থাকাটা তোমার জন্য ভাল হবে না। নানানজন নানান কথা বলবে। তাছাড়া ওরা তো সবকিছুতেই দেখেছি তোমার ওপর কমবেশি নির্ভরশীল।

একটু মানসিক আস্থা পেলেন তিনি। হেনার মুখের দিকে চেয়ে বললেন,

– ঠিক আছে তাহলে, তাই যাই, বলে চললেন হাসপাতালের দিকে।

লাশ বুঝে নিয়ে, এ্যাম্বুলেন্স ঠিক করে সবকিছু বুঝে নিয়ে গ্রামের দিকে রওনা দিতে দিতে প্রায় দুপুর গড়িয়ে এল। তিনি গেলেন না গ্রামে। বাসায় ফিরে দুপুরের খাওয়া সেরে একটু জিরিয়ে নিতে বিছানায় গড়িয়ে নিলেন কিছুক্ষণ।

হেনা বেগম পাশে বসে কী যেন বলতে চাইলেন। বুঝতে পেরে হাকিম সাহেব উঠি উঠি করছিলেন। হেনা বেগম কম যান না।

চিৎকার শুরু করলেন,

– বলি হল কী তোমার? বটগাছের কাছে যাবে নাকি আবার? হাকিম সাহেব তোপের মুখে আবার পড়েছেন বুঝলেন। শুনেছি বটগাছে নাকি পেত্নীর বাসা থাকে। বলি তোমাকে কী কোন পেত্নী আছর করল নাকি? সব ফেলে... বটগাছের মায়ায় তুমি সব ভুলে গেলে, বলে বিলাপ করতে শুরু করলেন।

ছেলে নীরব কলেজ থেকে ফিরে এসেছে। মার বিলাপ শুনে সে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল। হাকিম সাহেব বললেন,

– আজিমের বউ, আহা! বড় ভাল মানুষ ছিলেন। একটাই ছেলে ফাহিম, ক্লাস টেনে পড়ে। আহা! ছেলেটার জন্য মায়া হচ্ছে।

হেনা বেগম উঠে দাঁড়ালেন।

– কী হবে ছেলেটার এখন। মা-মরা ছেলে। কে দেখবে? আহারে বাছা! বলে আঁচলে মুখ ঢেকে ঘরের বাইরে এলেন।

হাকিম সাহেব বেশ চিন্তিত হলেন। হেনা বেগম কেমন যেন মুহূর্তের মধ্যে পাল্টে গেছেন। একটি মৃত্যু সংবাদে কেমন যেন তাকে মায়াময়ী মা মনে হচ্ছে। নিজের সন্তানরা সারাদিন মায়ের বকুনিতে অতিষ্ঠ থাকে, কিছুতেই কাছে ভিড়তে চায় না। সমস্ত আবদার আর বায়না সব বাবার কাছে। সেটাও তারা করে অতি গোপনে। ভাবখানা মা তাদের অনেক পর। সেই হেনা বেগম কেমন চুপসে গেলেন। মাতৃহীন অবুঝ বালকটির জন্য জগতের যত স্নেহ মায়া এসে তার বুকে মুখে বাসা বাঁধল। কিছুই ঠাহর করতে পারলেন না তিনি।

– আচ্ছা শোন, সে বছর আমরা যখন গ্রামে গেলাম তখন ফাহিমকে দেখেছিলাম, সারাক্ষণ নীরবের সঙ্গে থাকত। ওদের বাড়িতে যেতই না। কী লক্ষ্মী ছেলে! আচ্ছা, ওর আর কোনও খালা-চাচি আছে?

– সে তো ঠিক জানি না, বললেন হাকিম সাহেব।

– গেল ছেলেটার জীবন। দেখবে কিছুদিন পরে আজিম ভাই একটা

নতুন বউ ঘরে তুলবে আর এই ছেলেটা তখন ফ্যা ফ্যা করে এ বাড়ি ও বাড়ি ঘুরে বেড়াবে। সৎমার ঘরে ছেলে মানুষ হয়? আচ্ছা, আমরা তো কুলখানিতে যাব নাকি?

– হ্যাঁ, অনেক করে বলেছে, যেতে হবে।

– অবশ্যই যাব। ছেলেটার জন্য খুব মায়া হচ্ছে আমার। আচ্ছা, তুমি একবার আজিম ভাইকে মুখ ফুটে বলবে, আমরা ফাহিমকে ঢাকায় নিয়ে আসব আমাদের এখানে। এখানেই আমাদের সাথে থাকবে, পড়ালেখা করবে।

– আজিম তা মানবে কেন? এখন তো ছেলে ছাড়া ওর আর কেউ নেই।

– মানবে মানবে, হেনা বেগম বেশ জোর দিয়েই বললেন। পুরুষ মানুষ। বউয়ের শোক বড়জোর চল্লিশ দিন। আর যা বয়স, পঞ্চাশ পার হয়নি। ঠিক আবার বিয়ে করে সংসার শুরু করবে। আমি ঠিক বুঝতে পারি। যা হোক তুমি কিন্তু আজিম ভাইকে বলে ছেলেকে আমার জন্য এনে দেবে।

– তোমার নিজের দু'জনকে ঠিকমত দেখতে পার না। আবার আরেক জন?

– সে তোমাকে ভাবতে হবে না। বলছি যখন দায়িত্ব আমার। আমি তো তোমার মত দায়িত্বজ্ঞান ভুলে ছাদে গিয়ে গাছের সঙ্গে বসে থাকি না। ঐ ভাবলেই গা জ্বালা করে। কী আছে ওটাতে? উপড়ে ফেললেই তো হয়। একদিন দেখবে ঠিক ছাদ ফুটো করে শেকড়গুলো ঘরের মধ্যে ঝুলছে। তুমি এখনই ছাদে যাও। আমিও যাব। আমার সামনেই এই কাজটা করবে তুমি।

হাকিম সাহেব আর কথা বাড়ান না। চুপচাপ ঘরের বারান্দায় বসে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকেন।

নীরাও চলে এসেছে। দু'জনেই বারান্দায় বাবার পাশে গিয়ে দাঁড়ায়।

– আচ্ছা, আব্বু গাছটা নিয়ে মা যখন এতই চিন্তিত তুমি কেন সেটা কেটে ফেলছ না?

– কেন, গাছটা কী দোষ করেছে? বড় হচ্ছে হোক। পরে দেখা যাবে। এখনই তো কোনও সমস্যা হচ্ছে না।

দু'ভাই-বোনের দু'রকম মত। হাকিম সাহেব হাসলেন। দু'জনকে কাছে বসিয়ে বললেন,

– শোন, আচ্ছে করলেই তো উপড়ে ফেলা যায়। কিন্তু ইচ্ছা করলেই কী এমন একটা বটগাছ ছাদের কংক্রিটে পাওয়া যায়? তোমরা দেখেছ কখনও? কই আমাদের মত ছাদ তো এই এলাকায় কত আছে কিন্তু এ রকম গাছ কী আর কোনও ছাদে আছে? আর গাছটা তো আমরা কেউ লাগাইনি। যা আমি তৈরি করিনি তা আমরা ভাঙব কেন? আর সত্যি তো, এটা তো এই মুহূর্তে আমাদের কোনও ক্ষতি করছে না। গাছটার তো জীবন আছে। আমি কেন একটা জীবন হত্যা করব? ওটা থাকবে, যতদিন খুশি। তোমার মা সামান্য একটা গাছকে সহ্য করতে পারে না, সে আবার আস্ত একটা মানুষের জন্য মায়াকান্না জুড়ে দেয়।

– কেমন বাবা?

– ফাহিমকে তো চেন?

– হ্যাঁ, ওর মা তো আজ ভোরে মারা গেছে। তোমার আম্মু ফাহিমের দুঃখে কাতর হয়ে ওকে এখানে নিয়ে আসতে চাইছে।

নীরা আনন্দে নেচে ওঠে।

– তাহলে তো বাবা খুব মজা হবে। নিয়ে এস ওকে। আমাদের সঙ্গে থাকবে, খেলবে, স্কুলে যাবে, কী মজা হবে!

নিবিড় একটু বড়। সে বিষয়টা অনুধাবন করতে পারে। হুম বলে সে বারান্দা থেকে চলে যায়।

কাল কুলখানি। ভোরেই সবাই গ্রামের উদ্দেশে রওনা দিয়েছে। গাড়িতে নীরব মাকে জিজ্ঞেস করে,

– ফাহিমকে তুমি কাছে রাখতে চাও মা?

ঝট করে নীরা বলে,

– মা সত্যি তুমি ফাহিম ভাইয়াকে আমাদের সাথে নিয়ে আসবে?

হেনা বেগম বিরক্ত হন।

– তোমাদের তাতে কী? একটা মা-মরা এতিম ছেলে। হোক না একটু দূর-সম্পর্কের, তবুও তো মানুষ। চোখের সামনে তিলে তিলে নষ্ট হয়ে যাবে, আমি মা হয়ে তা কেমন করে সইব? যদি আমাদের উসিলায় সে তোমাদের মত করে বড় হয়, ক্ষতি কী? তোমাদের তো আরও একটা ভাই থাকতে পারত। মনে কর সেটাই ফাহিম। আর কোনও কথা নয়। আজিম ভাইয়ের সাথে কথা বলে ফাহিমকে আমার সাথে নিয়ে আসব।

– কিন্তু মা তুমি সারাদিনে যত চেঁচামেচি কর, ঘরবাড়ি মাথায় তুলে রাখ, এর মধ্যে ফাহিম এসে কয়দিন টিকে দেখ! যদি টিকতে না পারে, চলে যায় আমাদের ছেড়ে। তখন তোমার যে সুনাম হবে ওর দায়িত্ব নেয়ার জন্য, তার চেয়ে অনেক বেশি বদনাম হবে চলে আসার জন্য।

হেনা বেগম দীর্ঘ শ্বাস নিলেন,

– ওরে তোরা আমার চেঁচামেচিই দেখলি, আমার ভেতরে যে আর একটা আবেগঘন মায়াঘেরা মানুষ আছে সেটা কখনই বুঝলি না।

– সে সুযোগ তুমি দিয়েছ কখনও মা?

– সে কী দিতে হয়? খুঁজে নিতে হয়। খুঁজলেই পাবি। তোরা তো বড় হয়েছিস আমার বাইরের রূপটা দেখে।

– তুমি যদি তোমার সেই রূপটা লোহার বর্ম দিয়ে ঢেকে রাখ তবে আমরা দেখব কিভাবে? নীরব বলে। আর আমরা তো অনেক ছোট। এই যে বাবা, সে কী দেখেছে? ঐ একটা গাছ নিয়ে তুমি যে তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়ে রেখেছ, বাবা কী তোমাকে কিছু বলতে পেরেছে? ঐ গাছটার জন্য সারাক্ষণ তুমি বকতে থাক আর সে কারণে সবার মনে তোমার দূরত্ব বাড়তে থাকে।

আবারও জোরে নিঃশ্বাস ফেলেন হেনা বেগম।

– তোর বাবার কাছে ঐ গাছটাই এখন সব। সারাক্ষণ তাকে নিয়ে ভাবনা। বাড়ির কোনও কাজে তার মন নেই। ঘরে ফিরেই ছাদে যায়, কেউ গাছটা উপড়ে ফেলেছে কিনা তা পরখ করে দেখতে।

– সে ভয়ানক ভয় তো তুমিই ধরিয়েছ মা।

– তা ঠিক। কিন্তু এও তো ঠিক, একটা বটগাছের চারা, যা কোনও কাজে লাগবে না কখনও, আমার প্রতি সম্মান দেখিয়ে সে তো আমার কথা মানতে পারত। তা সে করল না কেন?

নীরবের গলা ধরে আসে। এই তার সেই মা! এত যুক্তি দিয়ে কথা বলছে সে। অথচ সারাদিন অযথাই যুক্তিহীন হৈ চৈ।

– সত্যি তো বাবা, তুমি এটা করতে পারতে।

গাড়ির জানালার বাইরে চেয়ে আছেন হাকিম সাহেব। মাঠভরা সোনালি পাকা ধান। তার মাঝখান দিয়ে চিকন সরু কাঁচাপাকা রাস্তা। গাড়ি ছুটে চলেছে গ্রামের দিকে। তিনি ভাবছেন, নীরবের প্রশ্ন তাকে ঠেলে নিয়ে গেছে জগতের অন্য প্রান্তে।

ঠিকই তো! স্ত্রীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য একটি গাছকে উপড়ে ফেলা আর এমন কী কঠিন! তা করা যেতেই পারে। কিন্তু বিপরীত প্রশ্ন তো থেকে যায়, কেন একটি সবুজ জীবনধারী বৃক্ষকে ধ্বংস করতে হবে একজন নারীরূপী মানুষের ইচ্ছাকে চরিতার্থ করার জন্য। সেও তো তার আপন ভাল লাগার মূল্যকে অমূল্য ভাবতে পারে। জগতে কত যে বিচিত্র মানুষ আছে যাদের বাইরের আর ভেতর মহল বিপরীত। ইচ্ছার প্রকাশ অনন্যসাধারণ। বৈপরীত্য আর দ্বন্দ্বে ভরা তাদের আপাদমস্তক। তবুও তারা খুব স্বাচ্ছন্দে মিশে আছে আমাদের মাঝে, আমাদের জগত- সংসারের ঘটে যাওয়া প্রতিটি উপাখ্যানে। আমরা কষ্ট পাই, আনন্দে বিহ্বল হই, আবার পরক্ষণে যুক্তির বেড়াজালে আবদ্ধ হই, ভালবাসি, পথ চলি এবং ক্রমশ এগিয়ে চলি নিঃশেষের দিকে।

এক সময় ওরা গ্রামের বাড়ি গিয়ে পৌঁছেন। হেনা বেগম ছুটে গিয়ে ফাহিমকে বুকে জড়িয়ে ধরেন। তারপর এক এক করে সবার সাথে শোকের মিছিলে একাত্ম হন। সারাক্ষণ তার সাথে ফাহিম। একবারও নীরা-নীরবকে কাছে ডাকেননি। ব্যাপারটা সবার চোখ এড়ালেও আজিমের চোখ এড়ায় না।

– ভাবী দোয়ায় শরীক হবেন। ভিতরে বসেন, আজিম হেনাকে ডাকেন।

ফাহিমকে ছাড়তে ইতস্তত করছিলেন তিনি। তবুও কিছুক্ষণের জন্য হেনা বেগম ফাহিমকে ছেড়ে দেন। সদ্য মাতৃহারা ফাহিম যেন মুহূর্তে মাকে কাছে পেয়ে যায়। ফাহিমের প্রতি এমন দরদ হেনার কাছ থেকে আশা

করছে না কেউ। আজিম আর হাকিম সাহেবের কাছেও ব্যাপারটা একটু দৃষ্টিকটু লাগছিল। তাছাড়া ফাহিমের নিজের কাছের আত্মীয়-স্বজনের কাছে আদিখ্যেতা বলে মনে হচ্ছিল।

রাতে সবাই ঐ বাড়িতেই থেকে যায়। কাছের আত্মীয়-স্বজন যে যার বাড়ি ফিরে গেছে। সকালে হাকিম-হেনা রওনা দেবে ঢাকায়।

– তুমি একটু ভাইকে বল না। হেনা হাকিম সাহেবে দৃষ্টি কাড়েন।

হাকিম সাহেব চুপ। হেনার কিছুতেই বাধ মানছে না। পারলে তিনি আজিমকে বলেই বসেন। শেষ পর্যন্ত তাকে বলা হল। আজিম কোনও উত্তর দেন না। তবে শারীরিক ভাষায় অস্বীকৃতি জানান। হেনা বেশ অভিমানী হয়ে ওঠেন। তার মনের ভাবটা কেউ বুঝতে পারছে না। তিনি তো ছেলেটির মঙ্গল কামনাতেই তার কাছে টানছেন। আর বিশেষ কিছু তো নয়। তবে তার মধ্যে যে আরও কিছু লুকনো ভাষা আছে, তা তিনি ছাড়া আর কেউই হয়তো জানেন না।

হেনা তার আচরণগত কারণে সংসারে স্বামী-সন্তানদের কাছ থেকে অনেকটা দূরে সরে গেছেন। তিনি এখন সংসারে সবার মধ্যে একা। তার নিজের মত করে কাউকে তিনি আপন করে গড়ে নিতে চান। একান্ত নিজস্ব আর আপন। এজন্যই তিনি কাউকে খুঁজছেন। ফাহিমকে এ মুহূর্তে তার ভীষণ পছন্দ আর প্রয়োজনও। তার নিজের সঙ্গে মিলে থাকার মত একজনকে তিনি তৈরি করতে চায়। তিনি ব্যর্থ হয়েছেন তার সন্তানদের কাছে, স্বামীর কাছে। কিন্তু মানুষ কী একা থাকতে পারে!

এমন গূঢ় অর্থ নিহিত ভাবনায় হোচট খেল হেনা। যদিও তার এই একান্ত চাওয়ার কারণ তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না। নিজের কাছে তাকে খুব ছোট মনে হয়। তিনি কি নিজেকে সংশোধন করেছে? খুব স্বাভাবিক স্ত্রী কিংবা মায়ের ভূমিকায় অভিনয় করবেন। তাতে করে হতেও তো পারে তার একচেটিয়া সম্মান। কাছে ফিরতে পারেন, সন্তানের সাথে, ফিরতে পারেন স্বামীর কাছে, এমন চিন্তা করতে থাকলেন বাড়ি ফেরার সমস্ত পথটা জুড়ে। কিন্তু সংসারে এত একা পারা যায়! কেন তিনি তা করবেন। বরং এমনই চলুক যেমন চলছে। আর কোনও আচরণই তো তিনি নিজে ইচ্ছে করে করছেন না। কী এমন বেশি করেছেন তিনি? বুয়ার সাথে চেঁচামেচি কোন জায়গায় না হয়? বুয়া কী তার স্বাভাবিক ব্যবহার করছে? একটু পাত্তা দিলেই তো মাথায় উঠে নাচতে শুরু করে। এমন ভেবে শক্ত হলেন তিনি। স্বামীর কথা ভাবলেন। সেই তো পাথরের মত মানুষ। আগে যা-ও একটু-আধটু কথা বলা যেত এখন আর মোটে কাছেই ভেড়া যায় না। মন খুলে একদণ্ড কথা বলে কী সে কোনদিন? ছেলেমেয়ে দুটোও যে যার মত নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। সারাদিন দরজা বন্ধ করে কম্পিউটার নিয়ে হয় কিছু দেখছে না হয় খেলছে। মাঝে মাঝে হাসছে উচ্চৈঃস্বরে। বড় বিরক্তিকর সংসার তার এখন। নিজেকে সামলানো দায়।

সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে যখন বাসায় ফিরে আসে সবাই, মনে হয় চার গ্রহের চারজন মানুষ একটি ঘরের তালা খুলছে। কেউ কাউকে চেনে না, কারও সাথে কারও যোগাযোগ পরিচয় হয়নি কোনওকালে। শুধু এই বাড়ির চারটি রুম বরাদ্দ আছে এই চারজনের জন্য।

হঠাৎ করে হেনা বেগম দ্রুত এক লাফে ছাদে উঠে গিয়ে বটগাছের চারাটা একটানে উপড়ে নিয়ে আসেন। হাকিম সাহেবের সামনে দু'পায়ে দলতে থাকেন গাছটাকে।

তার ক্রোধের কারণ কেউ জানে না। সবাই ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে দলিত গাছটার দিকে। সিঁড়ির শেষ ধাপে বসে পড়েন হাকিম সাহেব। ধারে দাঁড়িয়ে থাকে নীরা ও নীরব। চেঁচামেচি আর হট্টগোল বাধিয়ে ঘরে ঢুকছেন হেনা বেগম।

সমস্যাটা বোঝা গেল না। তাই কোনও মীমাংসাও সম্ভব হল না। সংসারটাই রইল অমীমাংসিত।

খোরশেদ বাহার
কবি, কথাকার

ঘটনাপঞ্জি ❖ নভেম্বর

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

০২ নভেম্বর ১৯৩৫	❖ শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের জন্ম
০৩ নভেম্বর ১৯৩৩	❖ নোবেলজয়ী অমর্ত্য সেনের জন্ম
০৪ নভেম্বর ১৯২৫	❖ চলচ্চিত্রকার ঋত্বিক ঘটকের জন্ম
০৫ নভেম্বর ১৮৭০	❖ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের জন্ম
১০ নভেম্বর ১৮৪৮	❖ 'রাষ্ট্রগুরু' সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম
১০ নভেম্বর ১৯৫৪	❖ কবি জয় গোস্বামীর জন্ম
১১ নভেম্বর ১৮৮৮	❖ মৌলানা আবুল কালাম আজাদের জন্ম
১১ নভেম্বর ১৯০৮	❖ গজেন্দ্রকুমার মিত্রর জন্ম
১২ নভেম্বর ১৮৯৬	❖ পক্ষীবিদ সেলিম আলীর জন্ম
১৪ নভেম্বর ১৮৮৯	❖ জওহরলাল নেহরুর জন্ম ॥ শিশু দিবস
১৫ নভেম্বর ১৮৭৫	❖ বীরসা মুণ্ডার জন্ম
১৯ নভেম্বর ১৮৩৮	❖ কেশবচন্দ্র সেনের জন্ম
১৯ নভেম্বর ১৯১৭	❖ শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর জন্ম
১৯ নভেম্বর ১৯২৩	❖ সলিল চৌধুরীর জন্ম
২০ নভেম্বর ১৭৫০	❖ টিপু সুলতানের জন্ম
২৩ নভেম্বর ১৮৯৭	❖ নীরদচন্দ্র চৌধুরীর জন্ম
২৫ নভেম্বর ১৯৩৪	❖ কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম
২৬ নভেম্বর ১৮৯০	❖ আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম
২৭ নভেম্বর ১৮৭৮	❖ কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর জন্ম
৩০ নভেম্বর ১৮৫৮	❖ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর জন্ম
৩০ নভেম্বর ১৯০৮	❖ বুদ্ধদেব বসুর জন্ম

শিশুতীর্থ

ভূতের ভূত-ভবিষ্যৎ

তৌহিদ-উল ইসলাম

ভূদেববাবু ভূতের গল্পকার। তাঁর গল্পগুলো অদ্ভুত। কিন্তু ভূতের তাতে জাত বাঁচে না। কেন-না তিনি ভূতের গল্পগুলোর মাধ্যমে বারবার প্রমাণ করে যাচ্ছেন 'ভূত বলে কিছু নেই।' ঠিক এ কারণেই ভূতসম্প্রদায় ভূদেব বাবুর ওপর মহা ক্ষ্যাপা। এখন ভূত মহলে ভূদেব বাবুই আলোচনার শীর্ষে।

এই নিয়ে সেদিন আমাবস্যা রাতে গৌরীকুণ্ডের জঙ্গলে ভূতদের এক জরুরি সভা বসে। ভূতরাজ ভূজঙ্গভীম ছিলেন সভার মধ্যমণি। ভূতরাজ তার বক্তব্যে বলেন, 'আমাদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে হলে প্রথমে ভূদেববাবুর মত লেখকদের ওপর আক্রমণ চালাতে হবে। যারা ভূতে বিশ্বাস করে না এবং অন্যদের বিশ্বাস করার সুযোগ দেয় না– তারাই আমাদের অন্যতম শত্রু।'

এমন নানা আলোচনার শেষে সিদ্ধান্ত হল: 'ভূদেব বাবুকে আক্রমণের মধ্য দিয়ে আজ রাতেই অভিযান শুরু করা হবে। লোভ দেখিয়ে হোক আর ভয় দেখিয়ে হোক ভূদেবকে আমাদের পক্ষে নিয়ে আসতেই হবে।'

এ অভিযানের জন্য দায়িত্ব পেলেন গেছোভূত ও মেছোভূত সর্দার। তারা কোন কারণে ব্যর্থ হলে অন্য ভূতদের পাঠানো হবে। আর হ্যাংলাভূত ও মংলাভূতের ওপর দায়িত্ব পড়ল ভূদেবের মত ভূতের শত্রুদের খুঁজে খুঁজে বের করে একটা তালিকা তৈরি করার।

এরপর সভা ভেঙে গেল।

ভূতরাজের নির্দেশ পেয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত ভূতেরা নিজ নিজ কাজে চলে গেল।

গেছোভূত ও মেছোভূত নন্দিকোটাল মাঠ পেরিয়ে, নীল সাগরের ঘাট পেরিয়ে, বন ছাড়িয়ে পৌঁছে গেল ভূদেববাবুর বাড়িতে।

প্রথমে গেছো ও মেছোভূত তাদের পরিচয় জানাল। তারপর আসল কথা শুরু করল। প্রথমে গেছো বলল, 'একমাত্র আপনার গল্পের কারণে ভূত সম্প্রদায় আজ বিলুপ্তির পথে।'

এবার মেছো বলল, 'ভূতের বংশ মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় এমন গল্প লেখা থেকে আপনাকে বিরত থাকতে হবে। নতুবা আপনার বিরুদ্ধে আমরা ভূতুড়ে ব্যবস্থা নেব।'

শুনে ভূদেববাবু বললেন, 'আমি চাই না আমার লেখায় কোন জাতির ক্ষতি হোক। তবে আমি নিশ্চিত যে, আমার লেখায় আপনাদের ক্ষতি না হয়ে বরং আপনাদের গুরুত্ব বহুলাংশে বৃদ্ধি পাচ্ছে।'

গেছোভূত প্রশ্ন করল, 'সেটা কী রকম?'

ভূদেব জবাব দিলেন, 'আমার লেখায় আমি ভূতকে যতই অস্তিত্বহীন বলে প্রমাণের চেষ্টা করি না কেন, তাতে কোন কাজ হয়নি বরং গল্পগুলো পড়ে বালক-বালিকারা রাতে ঘুমোতে পর্যন্ত পায় না। ফলে তাদের ঘাড় থেকে ভূত নামানোর জন্য অভিভাবকেরা নানা কবিরাজের দ্বারস্থ হন। কবিরাজ সাহেবদের তাবিজ-কবজ ও জটিল মন্ত্রতন্ত্রের জোরেই তো ভূত পালায়।'

মেছো বলল, 'ঠিক কথা তো! আপনাকে আমরা যতই দোষ দিই না কেন, প্রকৃত পক্ষে আপনার লেখায় তো আমাদের উপকারই হচ্ছে।'

ভূদেব আরও বললেন, 'বিষয়টি গভীরভাবে ভেবে দেখলে তাই হয়।'

এবার গেছো প্রশ্ন করে বসল, 'তা হলে আমরা দিনে দিনে হারিয়ে যাচ্ছি কেন? কেন হারিয়ে যাচ্ছে আমাদের বংশ পরিচয়?'

গেছোর প্রশ্নের জবাবে ভূদেববাবু বললেন, 'তার অন্যতম কারণ হল জঙ্গী।'

'জঙ্গী!'– গেছো ও মেছোভূতের একসাথে প্রশ্ন।

– মানে, কিছু মানুষ ভূত হবার আগেই জঙ্গলে বসবাস শুরু করে দেয়। তারা জীবন্ত মানুষও নয় আবার মৃত ভূতও নয়। এরা একদিকে মানুষের যেমন ক্ষতি করছে অন্যদিকে ভূতের আস্তানা দখল করে ভূতদেরও ক্ষতি করে চলছে। সুতরাং জঙ্গী দমন করতে পারলে ভূতেরা যেমন রক্ষা পাবে, আবার অন্যদিকে মানুষেরাও ...

এমন সময় হঠাৎ কার যেন পায়ের আওয়াজে থেমে গেল ভূদেববাবুর কথা।

ঠিক সেই মুহূর্তে হ্যাংলাভূত ও মংলাভূত সেখানে এসে উপস্থিত। তারা জানাল, 'একটা নতুন জাতি তাদের চণ্ডীঘট আস্তানা দখল করে বসে আছে। মানুষ ও ভূতের মাঝামাঝি এরা নাকি আরেক জাতি। আমাদের মত ওদের মুখভর্তি চুলদাড়ি, কালো রঙের জামাকাপড় পরনে আর সাথে রয়েছে ভারি ভারি সব অস্ত্রশস্ত্র।'

এবার ভূদেববাবুর কথা ষোল-আনাই প্রমাণ হল। ফলে আর কথা না বাড়িয়ে গেছো ও মেছোভূত হ্যাংলা ও মংলাকে সঙ্গে নিয়ে চণ্ডীঘট আক্রমণ করতে ছুটল। ভূদেববাবুও যোগ দিলেন ওদের সাথে।

খালবিল নদীনালা সাগর পাহাড় পর্বত অতিক্রম করে একসঙ্গে সবাই পৌঁছে গেল চণ্ডীঘট। ভূদেববাবু তো ঝোঁকের মাথায় ছুটে গিয়েছেন ভূতদের সঙ্গে। তার হাতে তো কোন অস্ত্রই নেই। শুধু ছিল একটা কলম। তিনি সবার আগে সেটাই খুব জোরে ছুঁড়ে মারলেন জঙ্গীদের ওপর।

হঠাৎ বিছানার পাশে থাকা কাঠের টেবিলের মধ্যে ডান হাতটা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে ঘুম ভেঙে যায় ভূদেববাবুর। তার হাতটা ব্যথায় চিন চিন করে ওঠে। বিছানা ছেড়ে ভোরের আলোয় তিনি কলমটা খুঁজতে থাকেন।

তৌহিদ-উল ইসলাম
শিক্ষক, গীতিকার

দর্পণ

ধারাবাহিক উপন্যাস

ঋতা বসু

ঋতা বসু। জন্ম কলকাতায়। আদি বাড়ি কুমিল্লা। পড়াশোনা শান্তিনিকেতন ও প্রেসিডেন্সি কলেজ। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনা। প্রিয় বিষয় রহস্য ও ইতিহাস। ছোটদের গল্প ও ছোটগল্প লিখে সাহিত্যের আঙ্গিনায় প্রবেশ। ক্রমশ উপন্যাসেও সমান স্বচ্ছন্দ। তাঁর সৃষ্ট পিন্টুমামা ও বাঘা এই চরিত্র দুটি তাদের রহস্যময় ও মজাদার কর্মকাণ্ডের জন্য পাঠকসমাজে প্রবল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য রচিত গোয়েন্দা শতদল একেবারে চারপাশে ঘটে চলা অপরাধ ও অপরাধীর মনস্তত্ত্ব নিয়ে পাঠককে আবিষ্ট রাখেন শেষমুহূর্ত পর্যন্ত। গল্প উপন্যাস ও রম্যরচনা নিয়ে প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা সাত। ছোট-বড় যে-কোন ভ্রমণেই সমান উৎসাহী। চিন জাপানের প্রাচীন ক্যালকুলেশন পদ্ধতি শিখেছেন আগ্রহের সঙ্গে। লেখালেখির সঙ্গে শিশুশিক্ষা ও টিচার্স ট্রেনিংয়ের সঙ্গে যুক্ত আছেন বহু বছর ধরে। ছোটদের এবং বড়দের দু'ধরনের লেখাতেই সমান স্বচ্ছন্দ।

• পূর্ব প্রকাশিত-র পর

তারপর মুখোমুখি

অভয় দরজা খুলে দিয়ে নীরবে পিয়ালীকে ভেতরে যাবার রাস্তা করে দিল। কাকিমার অবাক দৃষ্টির সামনে দিয়ে পিয়ালী কলের পুতুলের মত সিঁড়ি দিয়ে সোজা উঠে গেল রণোর ঘরের দিকে। আজ কে কি ভাবল তাতে তার কিছু এসে যায় না। রণো তাকে দেখে খুশিতে ঝলমল গলায় বলে উঠল, বাঃ অফিস কেটে? আমিও ভাগ্যিস যাব যাব করেও ডুব মেরেছি আজ। তা নাহলে তোমাকে মিস করতাম।

রণো হাত বাড়িয়ে পিয়ালীকে ধরবার চেষ্টা করতেই পিয়ালী হাত সরিয়ে রণোর সামনে এসে দাঁড়াল। রণোর মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। পারলে ডুবুরি হয়ে নেমে যায় রণোর মনের গভীরে। রণো অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল– এমন করছ কেন? কি হয়েছে?

– তুমি কোথায় ছিলে এই ক'দিন?

– তোমাকে তো বলেইছি।

– না। তুমি আমাকে সত্যি কথাটা বলনি।

– তাহলে তুমিই বল সত্যিটা কি? রণোর গলায় বয়ঃসন্ধির খুনসুটি।

– মলয় দত্ত কে? তার সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক?

মুহূর্তের মধ্যে ঘরের মধ্যে যেন বজ্রপাত হল– তুমি কোথা থেকে এই নাম জানলে? কে বলল তোমাকে?

– যে-ই বলুক যেভাবেই হোক জেনেছি। এইবার তোমার মুখ থেকে ভাল করে জানব বলে এসেছি।

রণো আচমকা পিয়ালীকে টেনে নেয় নিজের কাছে। শক্ত করে ধরে রাখে বুকের কাছে যেন ছেড়ে দিলেই পিয়ালী অদৃশ্য হয়ে যাবে। কাঁধের ওপর মুখ ঘষে জন্তুর মত। গুন গুন করে একটানা বলতে থাকে– বলব বলব। সব বলব তোমাকে। আমার আর কে আছে? আমি জানি তুমি আমাকে ভুল বুঝবে না। যে কষ্ট আমি পেয়েছি সারাজীবন সব তোমাকে বলে হাল্কা হব। তুমি আমাদের এই যে ছন্নছাড়া বাড়িটা দেখছ চিরকাল এটা এরকম ছিল না। আর পাঁচটা স্বাভাবিক বাড়ির মত লোকজন আত্মীয়স্বজনে গমগম করত এক সময়। স্পেশালি বাবা যখন ছুটিতে আসত। সেই সময় বন্ধুর ছদ্মবেশে একজন এসে আমাদের বাড়িটা, সেই সঙ্গে আমার জীবন তছনছ করে দিল। সেই লোকটাই মলয় দত্ত। আমার ছ'বছর বয়সে মা এই লোকটার সঙ্গে চলে যায়। বাবা সেবার ভাঙা মন নিয়ে ফিল্ডে গেল। আর ফিরল না।

রণজয় থামলে পর পিয়ালী বলল– এতগুলো বছর প্রতিহিংসা পুষে রেখে অরুণাচল পর্যন্ত ধাওয়া করে খুন করাটা একটু বাড়াবাড়ি নয় কি? ছ'বছর বয়সে যে মা চলে গিয়েছেন তার স্মৃতি তো কবেই ঝাপসা হয়ে গিয়েছে। কাকা-কাকিমা-ঠাকুমার কাছে স্নেহেরও অভাব ঘটেনি, তবে?

– ঠিকই বলেছ। এতদিন ধরে এমন তীব্র অনুভূতি ধরে রাখা কঠিন তো নিশ্চয়ই। কিন্তু আমাদের পরিবারের সবাই মিলে আমরা এই বিদ্বেষ পুষে রাখতে চেয়েছি। দিনে দিনে সেটা জমে আরও কঠিন জমাট হয়েছে। ঠাকুমার খুব ভয় ছিল মা আমাকে নিয়ে চলে যাবে। ঠাকুরদা মারা গেলে পর এক-দু'বার সেরকম চেষ্টাও হয়েছিল। সমস্ত পরিবারের সম্বল বলতে আমি। ঠাকুমা বলতেন– আমার ছেলেকে খেয়ে সাধ মেটেনি ডাইনিবুড়ির। আবার এসেছে তোকে খেতে। আমাদের পুরো পরিবারকে ধ্বংস করবে ওরা। তখন তো আমি আর শিশু নই ভালমন্দ বুঝতে পারা রীতিমত এক কিশোর। আমি সেদিন থেকে ওদের আরও বেশি ঘেন্না করি।

রণজয়ের মুখ বিকৃত হয়ে চোয়াল কঠিন হয়ে ওঠে। মাথার চুলগুলো মুঠো করে চেপে ধরে উত্তেজনার তীব্রতা কমাতে চায়। চোখে-মুখে কোথাও অনুশোচনা নেই। তার চোখের অতিরিক্ত উজ্জ্বলতায় পিয়ালীর কেমন অস্বস্তি বোধ হয়। চেপে রাখা আগ্নেয়গিরি ভলকে ভলকে কিছুটা আগুন উগরে এখন অনেকটা শান্ত।

পিয়ালী বলল– তাহলেও এতটা দীর্ঘ সময় পার করে এই বয়সে এসে হঠাৎ এই সিদ্ধান্ত নিলে কেন? ঘেন্না বিদ্বেষ নিয়ে দূরে সরে ছিলে তেমনই রইলে না কেন?

– সেই রকমই কথা ছিল। এতক্ষণে রণজয়কে যেন একটু আনমনা বলে মনে হল। প্রবল মানসিক পরিশ্রমে একটু ক্লান্তও যেন। বলল– হঠাৎ দুটো জিনিস ঘটল একই সঙ্গে। পুরনো বাক্স ঘেঁটে বাবার একটা চিঠি পেলাম। আর সেইদিনই কাগজে দেখলাম নর্দান লেদার্সের কর্মীরা মলয় দত্তের ষাট বছরের জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানিয়েছে। আলাদা করে মেয়ে-জামাই-নাতনিও খুব ঘটা করে তাদের ভালবাসা প্রকাশ করেছে। মলয় দত্ত ও তার স্ত্রীর হাসিমুখের ছবিও ছাপা হয়েছে। কতগুলো জীবনকে নষ্ট করে এরা সুখ কিনেছে ছবি দেখে সেটা বোঝার উপায় নেই। এরাই আজকের সমাজের আদর্শ মা-বাবা, স্বামী-স্ত্রী। সেই যুগলমূর্তি দেখার পর থেকেই আমার মাথায় যেন আগুন জ্বলে গেল। এই লোকটার জন্য আমার বাবা কষ্ট পেয়ে মারা গিয়েছেন। আমি সব থেকেও অনাথ। লোকের ঠাট্টার পাত্র। আর এখন এরা মেয়ে-জামাই-নাতনি নিয়ে মোচ্ছব করছেন। সারা জীবনের সমস্ত অপমান দুঃখ-কষ্টের শোধ নেবার জন্য অস্থির হয়ে উঠলাম।

– দিল্লিতে গিয়ে মারলে না কেন?

– তোমাকে সত্যি বলছি প্রথমে আমি খুন করার কথা ভাবিনি। একটা কঠিন প্রতিশোধ– সেটা যে ঠিক কি হতে পারে সে সম্বন্ধে আমার কোন পরিষ্কার ধারণা ছিল না। আমি কয়েকদিন গোপনে ওদের কাছাকাছি থাকতে চেয়েছিলাম। কৌতূহল তো ছিলই আর যাতে সুযোগ বুঝে কঠিন একটা আঘাত করতে পারি। কিন্তু সেটা বোধহয় খুন নয়। ওটা আচমকা ঘটে গিয়েছে।

– কি করে?

– প্রথম দিন ভালুকপংয়ে পৌঁছে সন্ধেবেলায় মলয় দত্তকে একা পেয়ে বললাম– আমি ওদের চিনি। রণজয় আমার পার্টনার। রণজয়ের নামটা শুনেই মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। বার বার বললেন ওঁর স্ত্রী যেন কিছুতেই জানতে না পারেন। ওঁর হার্টের প্রবলেম। যে কোন উত্তেজনাই ওর জন্য ভাল নয়। যেন যত জোর ওই ছ'বছরের ছেলেটারই ছিল। তার হার্ট-টার্ট বলে কিছু ছিল না। মলয় দত্ত তার বউকে কি বলেছিলেন বলতে পারব না। অন্য সবাইকে বলেছিলেন নদীর ধারটা ঘুরে দেখছিলেন। অপর্ণা দত্ত কিভাবে আন্দাজ করেছিলেন জানি না তাওয়াংয়ে আচমকা আমার ঘরে ঢুকে বলেছিলেন– রণোই কি তোমাকে পাঠিয়েছে?

আমি রুক্ষভাবে বললাম, তাতে আপনার কি?

– তাকে বোলো আমাকে যেন ক্ষমা করে।

আমি আর সামলাতে না পেরে বললাম, কেন ক্ষমা করবে সে? তাকে অকালে অনাথ করে এখন ক্ষমা চাইছেন?

আমার আরও বেশি ঘেন্না হচ্ছিল। পুরোটাই ভণ্ডামি মনে হচ্ছিল আর মনে হল এই মহিলাকে একটা কঠিন শাস্তি দেওয়া দরকার।

উনি আমার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলেন। ওঁর চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছিল। খুব অস্বস্তি হচ্ছিল। আমাকে চিনে ফেলেছেন ভেবে নার্ভাসও লাগছিল। ভাগ্যিস উনি কিছু বলার আগেই আমার রুমমেট বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল। পরদিনই সুযোগ পেয়ে গেলাম। আর ওঁর মুখোমুখি হতে হয়নি।

– বুঝলাম। তুমি কিভাবে দত্তদম্পতিকে অরুণাচলে যেতে রাজি করালে? পিয়ালী তার জেরায় কোন ফাঁক রাখে না। প্রতিটি শব্দ সে খোদাই করে নিচ্ছে তার মনের মধ্যে।

– নর্দান লেদার্সের ফোন নম্বর বার করতে কষ্ট হয়নি। ফোন করে নিজের পরিচয় দিয়ে বাবার চিঠিটা পড়ে শোনালাম– স্নেহের রানাই ও অপর্ণা তোমরা যুদ্ধ কি তা জান না। এখানে হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডায় শত্রুর সঙ্গে আমাদের কঠিন লড়াই চলছে। তোমাদের কাছে যখন এই চিঠি পৌঁছবে আমি তখন হয়তো এই পৃথিবীতে থাকব না। আর যদি না দেখা হয় তাই গোলাগুলির মাঝেই তোমাদের লিখছি। আমার কাছে আমার দেশ খুব মূল্যবান। এই দেশ রক্ষার জন্য হাসিমুখে প্রাণ দেওয়া তুচ্ছ ব্যাপার। রানাই তুমি বড্ড ছোট। অবশ্যই বড় হয়ে মায়ের সঙ্গে একবার তাওয়াং এস। তোমরা দু'জন আমার সব থেকে প্রিয় মানুষ। আমি এখানকার মাটিতেই মিশে থাকব। তোমরা এখানে এলেই তোমাদের প্রতি আমার যে ভালবাসা তা অনুভব করবে। সবার কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

জয় হিন্দ।

চিঠির বেশ কিছু কথা যে আমি ওদের রাজি করানোর জন্য বাড়তি জুড়ে দিয়েছি বুঝতেই পারছ। মলয় দত্তর সঙ্গেই কথা বলেছিলাম প্রথমে। কারণ ওঁর মনে বিশ্বাস জন্মানো, ওঁকে রাজি করানোই কঠিন কাজ বলে মনে হয়েছিল। উনি আমাদের বর্তমান অবস্থা জানতে চাইলেন বাড়িতে কে আছেন, আমি কি করছি ইত্যাদি। আমি স্বাভাবিকভাবে সমস্তই বললাম তার সঙ্গে যোগ করলাম আমি ও আমার স্ত্রী তাওয়াং ঘুরে এসেছি। বাবার শেষ ইচ্ছানুযায়ী মা যদি একবার যান তো ভাল হয়।

– কবে হল এসব কথা?

– হয়েছে। ফ্রেন্ডসের কথা আমিই বললাম ওদের।

– বুঝলাম। তা বাড়িতে বলে গেলে না কেন?

– এখন দেখছি ওইটিই ভুল হয়ে গিয়েছে। ভেবেছিলাম যদি কিছু অঘটন ঘটে যায় ওদের সঙ্গে আমাকে কেউ যেন জড়াতে না পারে। আমার বিন্দুমাত্র সম্পর্কও যেন আবিষ্কার না করতে পারে। তার জন্য আমার অরুণাচল যাত্রা গোপনই রেখেছিলাম। কারওকেই বলিনি। তবে ফোন নিশ্চয়ই করতাম। অরুণাচলে ফোনের লাইনের দুরবস্থার কথা জানতাম না। মোবাইল চলে না। যদি-বা একটা ফোন বুথ পাওয়া যায় তো লাইন পাওয়া যায় না। তার ওপর পায়ে আঘাত পাওয়ার দরুণ সহৃদয় অরিন্দম বাগচীদা সর্বক্ষণের সঙ্গী। এইটা একেবারে অপ্রত্যাশিত ছিল। তার

বিদায়ের ঠিক আগে কয়েক মুহূর্তের এই নির্জনতা ক'দিন আগেও কত উপভোগ্য ছিল। আজ জাফরি কাটা রেলিং দেওয়া সিঁড়ি ধরে নামতে নামতে পিয়ালীর মনে হচ্ছিল অনন্তকাল সে এমনি করে নামছে। এইটুকু রাস্তা বোধহয় কখনও শেষ হবে না। এই সিঁড়ি দিয়েই ওঠানামা করত অপর্ণা। আর একজন– মলয় দত্ত।

সামনে তামিলনাড়ুর প্রত্যন্ত গ্রামে তামিল মা-বাবা বা মেয়েকে ফোন করে বেণুগোপাল তো আর বাংলায় কথা বলতে পারে না। অতএব আর সুযোগ পেলাম না বাড়িতে ফোন করার। কিন্তু আমি ভাবিনি ফোন না পাবার ফলে এমন সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড ঘটবে। কাকা-কাকিমা যে পুলিশে ডায়েরি করবে এটা আমি কল্পনাও করতে পারিনি। তবে এখন দেখছি সেটা ভালই হয়েছে।

– আসলে তুমি মনে মনে প্রস্তুতই ছিলে। একটা অঘটন ঘটবে আগেই জানতে। সেইজন্য চেহারা পালটে নাম ভাঁড়িয়ে চোরের মত লুকিয়ে তুমি ওঁদের পেছন পেছন অরুণাচল গিয়েছ।

– কি জানি। আমি ঠিক বলতে পারব না– দু'হাত দিয়ে মাথার চুল মুঠো করে ধরল রণজয়। একটা ঘোরের মধ্যে বলতে লাগল– অত কাছ থেকে ক্রমাগত ওদের হাসি-ঠাট্টা গলাগলি ভাব দেখতে দেখতে আমার ভেতরে একটা আগ্নেয়গিরির ঘুম ভাঙছিল। মনে হত একটা অদৃশ্য অস্ত্রে শান দিয়ে চলেছি অবিরাম। দুঃস্বপ্ন দেখে মাঝরাতে ঘুম ভেঙে ভাবতাম কেন আমি এলাম এখানে এই নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে। মলয় দত্তকে আমি সামান্য একটা হিন্ট দিয়েছিলাম। সেই জন্য অপর্ণা দত্ত একদিন ছেলের বিষয়ে কিছু জানবার জন্য বোধহয় আমাকে ভজাতে এসেছিল। আমি দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছি। পরে যদি সন্দেহ করেও থাকে কি জানি কেন কারোকে কিছু বলেননি।

রণো তাচ্ছিল্যের ঠোঁট ওল্টাল– বোধহয় আমাকে দয়া করে।

পিয়ালী ভাবছিল কোন্ বীজ থেকে বিষবৃক্ষ জন্ম নেবে তা আজও অজানা আমাদের কাছে। কর্মের প্রতিক্রিয়া ও ফলের কাছে নিয়তি নির্দিষ্ট– মানুষ তাই বড় অসহায়। রণোর জীবনের মত ঘটনা তো কতই ঘটে। কিন্তু সবাই কি আর এমন উন্মাদ হয়?

পিয়ালী বরফের মত ঠাণ্ডা গলায় জিজ্ঞেস করল– তারপর?

– তাওয়াংয়ে পৌঁছবার পর আমার বাবার কথা ভেবে আরও বেশি অস্থির লাগছিল। ঠাকুমা বলতেন বউয়ের ভাবগতিক দেখেই নাকি বাবা ইচ্ছে করে নেফায় পোস্টিং নিয়েছিলেন। যাতে আর ফিরতে না হয়।

রণো হঠাৎ সরে আসে পিয়ালীর একদম কাছে। তার মুখটা দু'হাতে তুলে তাকিয়ে থাকে। বলে– তুমি আমাকে ভুল বুঝছ নাতো? রণোর চোখে ভয়।

পিয়ালী বুকে একটা অসহ্য চাপধরা কষ্ট টের পায়। তাকে জড়িয়ে ধরে আছে যে হাত তা প্রেমিকের, তা খুনীর। পিয়ালী আস্তে করে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে শান্তভাবে জিজ্ঞেস করল– তারপর?

– ষষ্ঠ লামর ভিটেয় পৌঁছে আমি নিরিবিলি জায়গা খুঁজছিলাম হালকা হব বলে। হঠাৎ দেখি মলয় দত্তও ওই একই কারণে আমার কাছাকাছি। একটু দূরেই বাবার স্মৃতিমাখা ওয়ার মেমোরিয়াল আর চারদিকে নিস্তব্ধ জঙ্গল। আমার মাথার মধ্যে কি যেন ভাঙচুর ঘটে গেল। টিকটিক করে কে বলে উঠল, এই সুযোগ হাতছাড়া কোরো না। সারা জীবনের আঘাত ফিরিয়ে দেবার এমন সুযোগ আর পাবে না। হাতে তুলে নিলাম একটা পাথর। মারার আগে মলয় দত্তর পেছনে দাঁড়িয়ে নিজের পরিচয়টা দেবার লোভ সামলাতে পারলাম না। ওর সমস্ত শরীরটা যেন ভয়ে জমে পাথর হয়ে গিয়েছিল। নড়ারও ক্ষমতা ছিল না। জোরে মারার জন্য নিজেও ব্যালান্স হারিয়ে পড়ে গিয়ে লিগামেন্টে দারুণ চোট পেলাম।

– তোমার মা আর তুমি তারপর কথা বলনি?

– না আর কিছু তো বলার নেই। আমার তর্পণ সম্পূর্ণ হল এতদিনে। অস্বাভাবিক মৃত্যু সন্দেহ করে গোয়েন্দা লেগেছিল আমাদের পেছনে। উনি পুলিশের লোককে আমার পরিচয় দিয়ে ওর সন্দেহের কথা বলতেই পারতেন। কিন্তু বলবে কি করে? তাহলে তো আগে নিজের কেচ্ছা বলতে হয়।

রণো পিয়ালীর গালে গাল রেখে বলে– তোমাকে নিশ্চয়ই সেই লোকগুলোই বলেছে এসব কথা। যাই বলুক সন্দেহ করা ছাড়া ওরা কিছুই প্রমাণ করতে পারবে না। শুধু তুমি জানলে সম্পূর্ণ সত্যিটা। তোমার কাছে আমি কিছুই গোপন করিনি। আমি জানি অন্তত একজন আমাকে ভুল বুঝবে না।

অস্ফুটভাবে প্লিজ প্লিজ বলতে বলতে সে মুখ ঘসে পিয়ালীর কাঁধে। পিয়ালী স্থির বসে রণজয়কে শান্ত হবার সময় দেয়। তারপর আস্তে করে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলে কাকিমার সঙ্গে দেখা না করেই ওপরে উঠে এসেছি। চল নিচে যাই।

নিজের শান্ত স্বাভাবিক ভাব দেখে পিয়ালী নিজেই অবাক হয়ে গেল। কাকিমা কিছু খেয়ে যাবার জন্য চাপাচাপি করছিলেন। পিয়ালী শরীর ভাল নেই বলে উঠে পড়ল। আগাগোড়া সময়টা রণজয় তাকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছে বলে পিয়ালীর মেরুদণ্ডটা শিরশির করে উঠল। প্রাণপণে শুকনো ঠোঁটে হাসি ফুটিয়ে বলল– চল, আমাকে এগিয়ে দেবে।

এই পুরনো বাড়িটার ঠাণ্ডা শান্ত ভাবটা সে সহ্য করতে পারছিল না। এক্ষুণি বাইরের রাস্তার হৈ-হট্টগোল ধোঁয়া-ধুলো-চেঁচামেচি-লোকজন সবই তার ভীষণ প্রয়োজন।

রণোও উঠে পড়ল তার সঙ্গে। এই সময় অভয় কখনও কাছে থাকে না। বিদায়ের ঠিক আগে কয়েক মুহূর্তের এই নির্জনতা ক'দিন আগেও কত উপভোগ্য ছিল। আজ জাফরি কাটা রেলিং দেওয়া সিঁড়ি ধরে নামতে নামতে পিয়ালীর মনে হচ্ছিল অনন্তকাল সে এমনি করে নামছে। এইটুকু রাস্তা বোধহয় কখনও শেষ হবে না। এই সিঁড়ি দিয়েই ওঠানামা করত অপর্ণা। আর একজন– মলয় দত্ত। ভয়ে জমে যাওয়া অদেখা মলয় দত্তর মুখটা পিয়ালীর বুকের মধ্যে যেন জলছবি হয়ে সেঁটে আছে। সে কিছুতেই ভুলতে পারছে না।

সিঁড়ির নিচে আবছায়ায় রণো বরাবরের মত তাকে জড়িয়ে ধরে ঠোঁটে ঠোঁটটা রাখল। পিয়ালীর হঠাৎ মনে হল এই বাড়িটা থেকে সে যদি আর না বেরোয় কেউ জানতেও পারবে না। তার মা-বাবা বন্ধু-বান্ধব কেউ রণোকে চেনে না। সে যে এখানে এসেছে তার কোন সাক্ষী পর্যন্ত নেই। রণোর হাত ঠোঁট তার কাঁধে গলায় চেপে বসে দমবন্ধ করে দিচ্ছে। সিঁড়ির তলায় আবছা অন্ধকার ক্রমশ তার চেতনাকে আরও অন্ধকারের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল।

হঠাৎ রণো তাকে ছেড়ে দিয়ে সদর দরজাটা খুলে দিল। আচমকা উজ্জ্বল আলোয় পিয়ালীর চোখ ধাঁধিয়ে গেল। বাইরের শব্দ তরঙ্গ গানের ঝর্না হয়ে ছড়িয়ে গেল চারদিকে। ফুটপাতে পা দিয়ে পিয়ালী বুকভর্তি বাতাস টানল। রণো দাঁড়িয়ে রয়েছে একশো বছরের পুরনো সেগুন কাঠের দরজার ফ্রেমে। শেষবারের মত দৃশ্যটা দেখল পিয়ালী। তারপর ব্যাগ থেকে শতদলের নাম ঠিকানা লেখা কার্ডটা বার করে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে মিশে গেল বাড়ি-ফেরা লোকজনের সঙ্গে।

• সমাপ্ত

ঋতা বসু
ভারতের কথাসাহিত্যিক

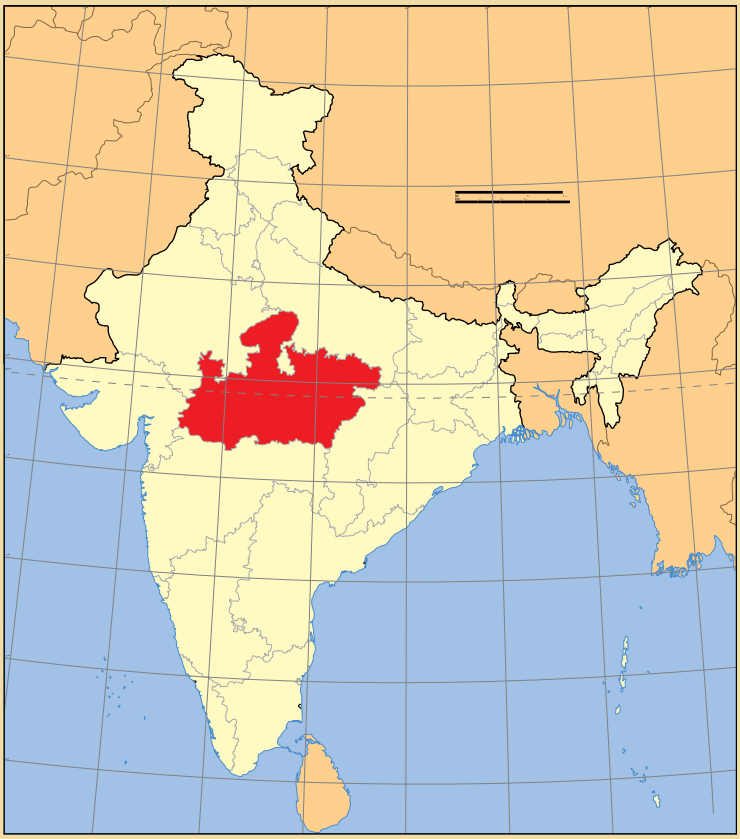

এক নজরে মধ্যপ্রদেশ

দেশ	ভারত
রাজধানী	ভূপাল
জেলা	৫১টি
প্রতিষ্ঠা	০১ নভেম্বর ১৯৫৮
সরকার	
• শাসকবর্গ	মধ্যপ্রদেশ সরকার
• রাজ্যপাল	ওম প্রকাশ কোহলি (অতি. দায়িত্ব)
• মুখ্যমন্ত্রী	শিবরাজ সিং চৌহান (বিজেপি)
• আইনসভা	এককক্ষ বিশিষ্ট
• সংসদীয় আসন	২৩০টি
• হাই কোর্ট	মধ্যপ্রদেশ হাই কোর্ট, জব্বলপুর
ক্ষেত্রফল	
• মোট	৩,০৮,২৫২ বর্গকিমি (১,১৯,০১৭ বর্গমাইল)
• এলাকা ক্রম	দ্বিতীয়
জনসংখ্যা (২০১১)	
• মোট	৭,২৫,৯৭,৫৬৫
• ক্রম	পঞ্চম
সময় অঞ্চল	ভারতীয় প্রমাণ সময় (ইউটিসি+০৫:৩০)
আইএসও ৩১৬৬ কোড	IN-MP
রাজ্য পশু	বারসিঙ্গা
রাজ্য পাখি	দুধরাজ
রাজ্য বৃক্ষ	বট
সরকারি ভাষা	হিন্দি
ওয়েবসাইট	www.mp.gov.in

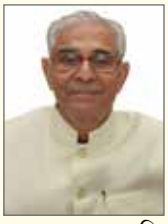

ওম প্রকাশ কোহলি

শিবরাজ সিং চৌহান

রাজ্য পরিচিতি

মধ্যপ্রদেশ

মধ্যপ্রদেশ মধ্য ভারতের একটি রাজ্য। এর রাজধানী ভূপাল, ইন্দোর বৃহত্তম শহর, গোয়ালিয়র, জব্বলপুর ও উজ্জয়িন অন্যান্য প্রধান শহর। ভৌগোলিকভাবে ভারতের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত মধ্যপ্রদেশ ক্ষেত্রফলের দিক থেকে ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম রাজ্য। এর জনসংখ্যা সাড়ে ৭ কোটি– জনসংখ্যার দিক থেকে এটি ভারতের ৬ষ্ঠ বৃহত্তম রাজ্য। এর উত্তর-পুবে উত্তর প্রদেশ, দক্ষিণ-পুবে ছত্তিশগড়, দক্ষিণে মহারাষ্ট্র, পশ্চিমে গুজরাট এবং উত্তর-পশ্চিমে রাজস্থান। এর মোট ক্ষেত্রফল ৩ লাখ ৮ হাজার ২ শো ৫২ বর্গ কিলোমিটার।

২০০০ সালের আগে ছত্তিশগড় মধ্য প্রদেশের অংশ থাকায় মধ্যপ্রদেশ ছিল ভারতের সর্ববৃহৎ রাজ্য। তখন রাজ্যের দুই প্রান্ত সিঙ্গোলি ও কোন্টার মধ্যে দূরত্ব ছিল ১৫০০ কিলোমিটার।

আইআইআইটিডিএম জব্বলপুর ক্যাম্পাস

আইপিএস একাডেমিক প্রধান ভবন

আজকের মধ্য প্রদেশের মধ্যে প্রাচীন অবন্তী মহাজনপদ অন্তর্ভুক্ত, যার রাজধানী ছিল উজ্জয়িন (অবন্তিকা নামেও পরিচিত)। খ্রিস্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতকে ভারতে নগরায়নের দ্বিতীয় দফায় এটি একটি প্রধান নগর হিসেবে গড়ে ওঠে। পরবর্তীকালে এলাকাটি ভারতের প্রধান প্রধান রাজবংশের হাতে শাসিত হয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে অঞ্চলটি ছোট ছোট অনেক রাজ্যে বিভক্ত ছিল। ব্রিটিশরা সবগুলো রাজ্য দখল করে সেন্ট্রাল প্রোভিন্স এন্ড বিহার এবং সেন্ট্রাল ইন্ডিয়া এজেন্সির অন্তর্ভুক্ত করে। ভারতের স্বাধীনতার পর নাগপুরকে রাজধানী করে মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের সৃষ্টি হয়। তখন এ রাজ্যের সঙ্গে বর্তমান মধ্য প্রদেশের দক্ষিণাঞ্চল এবং আজকের মহারাষ্ট্রের উত্তর-পূর্বাঞ্চল অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯৫৬ সালে রাজ্যটি পুনর্গঠিত হয় এবং এর অংশগুলো মধ্য ভারত, বিন্ধ্য প্রদেশ ও ভূপালের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নতুন মধ্যপ্রদেশ রাজ্য গঠিত হয়, আর মারাঠিভাষী বিদর্ভকে বোম্বে রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত করা হয়।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে রাজ্যের গড় দেশজ উৎপাদন প্রবৃদ্ধি জাতীয় প্রবৃদ্ধির চেয়ে বেশি। খনিজ সম্পদে সম্পৃদ্ধ মধ্য প্রদেশে ভারতের সবচেয়ে বড় হীরা ও তামার মজুত রয়েছে। রাজ্যের ৩০ শতাংশের বেশি এলাকা অরণ্য আচ্ছাদিত। এর পর্যটন শিল্পের উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি ঘটেছে, ২০১০-১১ সালে মধ্যপ্রদেশ জাতীয় পর্যটন পুরস্কার লাভ করে।

ইতিহাস

নর্মদা উপত্যকার হাতনোড়ার এখানে-সেখানে হোমো ইরেকটাসের ফসিল ইঙ্গিত দেয় যে, মধ্য প্রদেশে মধ্য প্লেইস্টোসিন যুগের মানুষের বসতি ছিল। মোসোলিথিক যুগের শেষের দিকের চিত্রিত তৈজসপত্র ভীমবেটকার পাথর-আশ্রয়স্থলসমূহে পাওয়া গেছে। কয়াথা সংস্কৃতির (খ্রিস্টপূর্ব ২১০০-১৮০০) চালকোলিথিক স্থানসমূহ এবং মালোয়া সংস্কৃতির (খ্রি.পূ. ১৭০০-১৫০০) নানা প্রত্ননিদর্শন রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলে আবিষ্কৃত হয়েছে।

উজ্জয়িনের কথা আগেই বলেছি। এটি ছিল অবন্তী রাজ্যের রাজধানী। প্রাচীন মহাকাব্যে মালোয়া, করুষ, দর্শন, নিষাদ প্রভৃতি রাজ্যের যে উল্লেখ আছে, তা মধ্য প্রদেশের অংশ বলেও চিহ্নিত হয়েছে।

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য খ্রি.পূ. ৩২০ নাগাদ উত্তরাঞ্চলীয় ভারতকে একতাবদ্ধ করে মৌর্য সাম্রাজ্যের পত্তন করেন, যাতে আজকের মধ্য প্রদেশের সব অঞ্চলই অন্তর্ভুক্ত ছিল। মহান মৌর্য শাসক অশোক গোটা এলাকাকে আরো সংঘবদ্ধ করেন। মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর ১ম-৩য় শতাব্দীতে অঞ্চলটি শক, কুশান, সাতবাহন ও অন্যান্য স্থানীয় রাজবংশ দ্বারা শাসিত হয়। শুঙ্গরাজা ভগভদ্রের রাজসভায় আগত গ্রিক দূত হেলিওডোরাস বিদিশার কাছে হোলিডোরাস স্তম্ভ স্থাপন করেন।

খ্রি.পূ. প্রথম শতকেই উজ্জয়িন পশ্চিম ভারতের এক গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসেবে পরিগণিত হয়। গঙ্গা সমভূমি ও ভারতের আরব সাগর তীরবর্তী বিভিন্ন বন্দরের মধ্যে অবস্থিত হওয়ায় বাণিজ্য কেন্দ্র হিসেবে উজ্জয়িনের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম।

দাক্ষিণাত্যের উত্তরাঞ্চলের সাতবাহন রাজবংশ এবং পশ্চিমাঞ্চলীয় সাতরাপের শক রাজবংশের মধ্যে মধ্য প্রদেশের দখল নিয়ে প্রথম থেকে তৃতীয় শতকে বহু যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। সাতবাহন রাজা গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী দ্বিতীয় শতকে শক শাসকদের বিরুদ্ধে এক ভয়ংকর যুদ্ধে লিপ্ত হন এবং মালোয়া ও গুজরাট অঞ্চল দখল করে নেন।

পরবর্তীকালে চতুর্থ-পঞ্চম শতকে অঞ্চলটি গুপ্ত সাম্রাজ্য ও তাদের দক্ষিণাঞ্চলীয় প্রতিবেশী বাকাতক সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রণে আসে। ধর জেলার কুকশি তহসিলের বাঘগুহার পাথর-কেটে নির্মিত মন্দিরবাদি এতদঞ্চলে গুপ্ত রাজবংশের উপস্থিতি প্রমাণ করে। ৪৮৭ খ্রিস্টাব্দের একটি বাড়বানি শিলালিপিতেও এর সমর্থন মেলে। হেফথালাইটিস বা সাদা হূনদের পৌনঃপুনিক আক্রমণে গুপ্ত সামাজ্যের পতন ঘটে এবং অনেকগুলি ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে। মালোয়ার রাজা যশধর্মন ৫২৮ খ্রিস্টাব্দে হুনদের পরাজিত করে তাদের অগ্রযাত্রা থামিয়ে দেন। পরে হর্ষ (৫৯০-৬৪৭ খ্রিস্টাব্দে) রাজ্যের উত্তরাঞ্চলে শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। অন্যদিকে খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকের শেষ দিক থেকে দশম শতাব্দী পর্যন্ত দক্ষিণ ভারতের রাষ্ট্রকূট রাজবংশের শাসকরা মালোয়া শাসন করেন। দক্ষিণ ভারতীয় সম্রাট তৃতীয় গোবিন্দ মালোয়াকে রাষ্টকূট রাজ্যের সঙ্গে সংযুক্ত করে তাঁর একজন অধঃস্তনকে সেখানকার শাসনক্ষমতায় প্রতিষ্ঠা করেন, যিনি পারমার নামধারণ করেন।

মধ্যযুগে রাজপুত গোষ্ঠীর উত্থান দেখা যায়। এদের মধ্যে মালোয়ার পারমার ও বুন্দেলখণ্ডের খাণ্ডেলারাও ছিলেন। খাণ্ডেলারা খাজুরাহে অনেক হিন্দু-জৈন মন্দির নির্মাণ করেন যা মধ্য ভারতের হিন্দু মন্দির স্থাপত্যের চূড়ান্ত উৎকর্ষতার নজির। এসময় উত্তর ও পশ্চিম মধ্য প্রদেশে গুর্জর ও প্রতিহার রাজবংশও প্রভাব বিস্তার করে। এরা গোয়ালিয়রেও কিছু স্থাপত্য মূল্যসম্পন্ন স্মারক তৈরি করেন। দক্ষিণ ভারতীয় পশ্চিমা চালুক্য সাম্রাজ্য মালোয়ার মত মধ্য প্রদেশের দক্ষিণাঞ্চলে অনেকবার দখল প্রতিষ্ঠা করে এবং মালোয়ার পারমার রাজাদের ওপর তার কর্তৃত্ব চাপিয়ে দেয়। পারমার রাজা ভোজ (১০১০-১০৬০ খ্রিস্টাব্দ) ছিলেন খ্যাতনামা বহু বিদ্যাবিশারদ। রাজ্যের গণ্ডোয়ানা ও মহাকোশল অঞ্চলে ছোট গণ্ড রাজ্যের উদ্ভব হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মধ্য প্রদেশের উত্তরাঞ্চল তুর্কি-দিল্লি সুলতানাত দখল করে নেয়। চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগে দিল্লি সুলতানের পতনের পর আঞ্চলিক স্বাধীন রাজ্যের পুনরাবির্ভাব ঘটে। এদের মধ্যে গোয়ালিয়রের তোমার রাজ্য এবং মাণ্ডুকে রাজধানী করে মালোয়ার মুসলিম সুলতানাত উল্লেখযোগ্য।

গোয়ালিয়র দুর্গ

বাতেশ্বর মন্দির

অমরকণ্টক

১৫৩১ খ্রিস্টাব্দে গুজরাট সুলতানাত মালোয়া সুলতানাতকে হটিয়ে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। পঞ্চদশ শতকের ৪০-এর দশকে রাজ্যের অধিকাংশ এলাকা শের শাহ সুরি দখল করে নেন। পরবর্তীকালে সুরি রাজবংশের একদা সেনাধ্যক্ষ হিন্দু রাজা হিমু ১৫৫৩-৫৬ খ্রিস্টাব্দে গোয়ালিয়র দুর্গ থেকে যুদ্ধ পরিচালনা করে দিল্লির শাসক হয়। তিনি বিক্রমাদিত্য নামধারণ করে বাংলা থেকে গুজরাট পর্যন্ত ২২বার যুদ্ধে জয়ী হন। ১৫৫৬ সালের ৭ অক্টোবর তিনি দিল্লির যুদ্ধে আকবরের বাহিনিকে পরাজিত করেন। আনুষ্ঠানিক রাজ্যাভিষেকের পর তিনি দিল্লিকে তাঁর রাজধানী হিসেবে বেছে নেন এবং গোয়ালিয়র ছেড়ে যান। ১৫৫৬ সালে দ্বিতীয় পানিপথের যুদ্ধে হিমুর পরাজয়ের পর মধ্য প্রদেশের অধিকাংশ এলাকা মুঘল শাসনাধীন হয়। গণ্ডোয়ানা ও মহাকোশল গণ্ডরাজাদের শাসনাধীন থাকে। এঁরা মুঘল কর্তৃত্ব স্বীকার করে কার্যত স্বায়ত্তশাসন ভোগ করেন।

১৭০৭ সালে সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মুঘল নিয়ন্ত্রণ লক্ষণীয়ভাবে হ্রাস পায়। ১৭২০ থেকে ১৭৬০ সালের মধ্যে মারাঠারা মধ্য প্রদেশের অধিকাংশ অঞ্চলের দখল নেয়। ফলে পুনের পেশোয়ার নামমাত্র নিয়ন্ত্রণে কয়েকটি আধা-স্বায়ত্তশাসিত রাজ্যের সৃষ্টি হয়। যেমন: ইন্দোরের হোলকাররা মালোয়ার অনেকাংশ, পুয়াররা দেওয়াস ও ধর, নাগপুরের বনশালরা মহাকোশল ও গণ্ডোয়ানা এলাকায় প্রভাব বিস্তার করে, গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়ারা রাজ্যের উত্তরাংশের নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করে। এসব মারাঠা শাসকদের মধ্যে মাহদজী সিন্ধে, অহল্যাবাঈ হোলকার ও যশবন্ত রাও হোলকার বিখ্যাত। এসব ছাড়াও আরো অনেক ছোট ছোট রাজ্যের উদ্ভব হয়, যেমন ভুপাল, ওর্ছা ও রেওয়া। মারাঠা ও হায়দ্রাবাদের নিজাম– উভয়েরই মান্যতা স্বীকার করে মুঘল সেনাবাহিনির একদা সেনাধ্যক্ষ দোস্ত মোহাম্মদ খান ভুপাল রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

তৃতীয় ঈঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের পর ব্রিটিশরা গোটা এলাকার ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। এলাকার সব সার্বভৌম রাজ্য ব্রিটিশ ভারতের প্রিন্সলি স্টেটে পরিণত হয়। আর এ-সব প্রিন্সলি স্টেটের শাসনভার ন্যস্ত ছিল সেন্ট্রাল ইন্ডিয়া এজেন্সির হাতে। মহাকোশল এলাকা ব্রিটিশ প্রোভিন্সে পরিণত হয়, নাম হয় সাগর ও নারবুদ্ধ টেরিটোরিজ। ১৮৬১ সালে সেন্ট্রাল প্রোভিন্স গঠনের জন্য ব্রিটিশরা নাগপুর প্রোভিন্সকে সাগর ও নারবুদ্ধ টেরিটরিজের সঙ্গে যুক্ত করে।

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহকালে রাজ্যের উত্তরাংশের নেতৃত্ব দেন তাতিয়া তোপি। ব্রিটিশ ও তাদের দোসর প্রিন্সরা সেনাবিদ্রোহ কঠোরহস্তে দমন করেন কিন্তু তারপর থেকে ব্রিটিশ বিরোধী ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন চলতেই থাকে। এসব সংগ্রামে নেতৃত্ব দেন এখানকার ভূমিপুত্র চন্দ্রশেখর আজাদ, বি আর আম্বেদকর, শংকরদয়াল শর্মা, অটলবিহারী বাজপেয়ী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

ভারতের স্বাধীনতার পর ১৯৫০ সালে নাগপুরকে রাজধানী করে সাবেক ব্রিটিশ সেন্ট্রাল প্রোভিন্স এন্ড বিহার এবং প্রিন্সলি স্টেট মাকরাই ও ছত্তিশগড় নিয়ে মধ্যপ্রদেশ সৃষ্টি হয়। সেন্ট্রাল ইন্ডিয়া এজেন্সির বাইরে নতুন রাজ্য মধ্য ভারত, বিন্ধ্য প্রদেশ ও ভুপালকে মধ্য প্রদেশের সঙ্গে যুক্ত করা হয় এবং নাগপুরসহ মারাঠাভাষী দক্ষিণাঞ্চল বিদর্ভকে বোম্বে রাজ্যের

বারসিঙ্গা

হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়। জব্বলপুরকে রাজ্যের রাজধানী হিসেবে নির্বাচিত করা হয়, কিন্তু শেষ মুহূর্তে রাজনৈতিক চাপে ভুপালকে রাজ্যের রাজধানী করা হয়। ২০০০ সালে মধ্যপ্রদেশ পুনর্গঠন আইনে রাজ্যের দক্ষিণাঞ্চলীয় অংশ ভেঙে নতুন ছত্তিশগড় রাজ্যের সৃষ্টি হয়।

ভূগোল

অবস্থান: মধ্যপ্রদেশ আক্ষরিক অর্থে ভৌগোলিকভাবে ভারতের কেন্দ্রস্থলে ২১.২° উত্তর থেকে ২৬.৮° উত্তর অক্ষাংশ এবং ৭৪.০২° পূর্ব থেকে ৮২.৪৯° পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। বিন্ধ্য ও সাতপুরা পবর্তমালার মধ্য দিয়ে পুবে-পশ্চিমে নর্মদা নদী প্রবাহিত। এই পর্বতমালা ও নর্মদা নদী উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের ঐতিহ্যবাহী সীমানা। মধ্য প্রদেশের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ হচ্ছে ধূপগড়, উচ্চতা ১হাজার ৩শো ৫০মিটার (৪হাজার ৪শো

সহস্র বুদ্ধ মন্দির, গোয়ালিয়র দুর্গ

খাজুরাহো কাণ্ডারিয়া মহাদেও মন্দির

ওর্ছার লক্ষ্মী মন্দির

কানহা টাইগার প্রকল্প

২৯ ফুট)। মধ্য প্রদেশের পশ্চিমে গুজরাট, উত্তর-পশ্চিমে রাজস্থান, উত্তর-পুবে উত্তর প্রদেশ, পূর্বে ছত্তিশগড় এবং দক্ষিণে মহারাষ্ট্র।

জলবায়ু

মধ্য প্রদেশের জলবায়ু উপ-ক্রান্তীয়। উত্তর ভারতের অধিকাংশ এলাকার মত গ্রীষ্মে (এপ্রিল-জুন) প্রচণ্ড গরম পড়ে। গ্রীষ্মের পর আসে বর্ষা (জুলাই-সেপ্টেম্বর)। বর্ষার পর অপেক্ষাকৃত শুষ্ক শীতকাল। গড় বৃষ্টিপাত প্রায় ১হাজার ৩শো ৭১ মিলিমিটার (৫৪ ইঞ্চি)। দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে ভারী বৃষ্টিপাত হয়, কোথাও কোথাও ২হাজার ১শো ৫০ মিমি (৮৪.৬ ইঞ্চি) পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হয়। তবে পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বৃষ্টিপাত কম– ১০০০ মিমি (৩৯.৪ ইঞ্চি) মাত্র। বৃষ্টিপাতের এই তারতম্যের জন্য মধ্যপ্রদেশ একইসঙ্গে সবুজ এবং রুক্ষ।

ভোজপুরের শিব মন্দির

প্রতিবেশ

২০১১ সালের উপাত্ত অনুযায়ী, রাজ্যের রেকর্ডকৃত বনাঞ্চলের ক্ষেত্রফল ৯৪হাজার ৬শো ৮৯ বর্গকিমি (৩৬হাজার ৫শো ৬০ বর্গমাইল), রাজ্যের ভৌগোলিক এলাকার ৩০.৭২ শতাংশ, ভারতের মোট বনাঞ্চলের ১২.৩০ শতাংশ। রাজ্যের বনাঞ্চলের মধ্যে সংরক্ষিত বন (৬৫.৩ শতাংশ), সুরক্ষিত বন (৩২.৮৪ শতাংশ) এবং অশ্রেণিবদ্ধ বন (০.১৮ শতাংশ)। মাথাপিছু বনাঞ্চল ২হাজার ৪শো বর্গমিটার (০.৫৯ একর), যেখানে জাতীয় গড় ৭০০ বর্গমিটার (০.১৭ একর)।

উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলে বন কম, এসব অঞ্চলে গুরুত্বপূর্ণ নগর কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। জলবায়ুর বৈচিত্র্য ও মাটির গুণ বিচারে রাজ্যের বনাঞ্চলে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। রাজ্যে কালো মাটি পাওয়া যায় মালোয়া, মহাকোশল ও দক্ষিণের বুন্দেলখণ্ড এলাকায়; লাল ও হলুদ মাটি পাওয়া যায় বাঘেলখণ্ড এলাকায়; পলিমাটি পাওয়া যায় মধ্য প্রদেশের উত্তরাঞ্চলে; অন্যদিকে ল্যাটেরাইট মাটি পাওয়া যায় উচ্চ এলাকায়। এছাড়া মিশ্র মাটি পাওয়া যায় গোয়ালিয়র ও চম্বল বিভাগে।

উদ্ভিদ ও প্রাণি

মধ্য প্রদেশে ৯টি জাতীয় উদ্যান রয়েছে। এগুলি হচ্ছে: বান্ধবগড়, কানহা, সাতপুরা, সঞ্চয়, মাধব, বনবিহার, মাণ্ডলা উদ্ভিদ ফসিল, পান্না এবং পেঞ্চ জাতীয় উদ্যান। অনেকগুলি প্রকৃতি সংরক্ষণশালা রয়েছে, যেমন অমরকণ্টক, বাঘগুহা, বলাঘাট, বোরি প্রাকৃতিক সংরক্ষণশালা, কেন-ঘড়িয়াল, ঘটিগাঁও, কুনো পালপুর, নারোয়ার, চম্বল, খুদেশ্বর নরসিংহগড়, নোরা দেহি, পাঁচমারি, পানপাতা, শিকারগঞ্জ, পাতালকোট ও তামিয়া। সাতপুরা পর্বতমালায় পাঁচমারি বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ, অমরকণ্টক বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ এবং পান্না জাতীয় উদ্যান ভারতের ১৮টি বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভের ৩টি। এসবের অধিকাংশই জব্বলপুরের কাছে পূর্ব-মধ্যপ্রদেশ অঞ্চলে অবস্থিত।

কানহা, বান্ধবগড়, পেঞ্চ, পান্না ও সাতপুরা জাতীয় উদ্যান রক্ষণাবেক্ষণ হয় বাঘ প্রকল্প হিসেবে। ন্যাশনাল চম্বল স্যাংচুয়ারি রক্ষিত হয় ঘড়িয়াল ও ভারতীয় কুমীর (মকর), শুশুক, উদ্বিড়াল (ভোঁদড়) ও বিভিন্ন প্রজাতির কচ্ছপ সংরক্ষণে। কেন্-ঘড়িয়াল ও সোন-ঘড়িয়াল স্যাংচুয়ারিতে ঘড়িয়াল ও উদ্বিড়াল সংরক্ষিত হয়। বারসিঙ্গা হচ্ছে রাজ্য পশু এবং দুধরাজ রাজ্য পাখি। রাজ্য গাছ বট। রাজ্য মাছ মহাশোল, রাজ্য ফুল ম্যাডোনা লিলি। শাল ও সেগুন রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ বনগঠনকারী উদ্ভিদ।

নদী

নর্মদা মধ্য প্রদেশের দীর্ঘতম নদী। উত্তরপাড়ে বিন্ধ্য পর্বতমালা ও দক্ষিণপাড়ে সাতপুরা পর্বতমালা রেখে নর্মদা পশ্চিম দিকে প্রবাহিত। এর শাখা হচ্ছে বানজার, তোয়া, মাচনা, শাক্কর, দেনবা ও সোনভদ্রা। উপত্যাকার ফাটল দিয়ে তপতী নদী নর্মদার সমান্তরালে প্রবাহিত হয়েছে। নর্মদা-তপতী জলধারা বিপুল পরিমাণ জল ধারণ করে এবং মধ্য প্রদেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ এলাকায় জলসিঞ্চন করে। নর্মদাকে পবিত্র নদীজ্ঞানে গোটা এলাকার মানুষ বন্দনা করে। এটিই রাজ্যের জলের প্রধান উৎস এবং

অশোকনগরের কাছে বেতোয়া নদী

ধুয়াদ্ধর জলপ্রপাত

প্রাণসঞ্জীবনী হিসেবে কাজ করে।

বিন্ধ্য পর্বতমালা গঙ্গা বেসিনের দক্ষিণ সীমানা তৈরি করেছে। গঙ্গা বেসিনের পশ্চিমাংশ যমুনায় পতিত হয়েছে এবং পূর্বাংশ সরাসরি গঙ্গায় মিশেছে। গঙ্গায় যে-সব নদী মিশেছে, সেগুলো দক্ষিণ থেকে উত্তরে প্রবাহিত। যমুনার প্রধান শাখা নদীগুলি হচ্ছে চম্বল, শিপ্রা, কালীসিন্ধু, পার্বতী, কুনো, সিন্দ, বেতোয়া, ধাসন ও কেন্। শিপ্রাও হিন্দুধর্মের অন্যতম পবিত্র নদী। এখানে প্রতি ১২ বছরে কুম্ভ মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এসব নদীর জলসিঞ্চনে কৃষিকাজ হয়। এছাড়া সাধারণত ঘাস ও কাঁটা জাতীয় গাছ জন্মে। গঙ্গা বেসিনের পূর্বাংশে সোন, তোন ও বিহান্ড নদীর উৎপত্তি। সোনের উৎপত্তি অমরকণ্টকের আশেপাশের মইকাল পাহাড় থেকে। সোন সবচেয়ে বড় শাখানদী যা গঙ্গার দক্ষিণপাড়ে পতিত হয়েছে– যার উৎপত্তি হিমালয় নয়। সোন ও এর শাখা-প্রশাখা গঙ্গার মৌসুমিপ্রবাহে বিপুল জলরাশির যোগান দেয়। এই বেসিনের বৃক্ষরাজি মধ্য প্রদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের বনাঞ্চলের চেয়ে সমৃদ্ধ।

ছত্তিশগড় রাজ্য গঠিত হবার পর মহানদী বেসিনের একটি বড় অংশ ছত্তিশগড়ে পড়ে। বর্তমানে অনুপপুর জেলার হাসড়ো নদীর মাত্র ১৫৪ বর্গ কিমি মধ্য প্রদেশে পড়েছে। গবিলগড় এবং মহাদেও পর্বতের সাতপুরা পর্বতমালা দক্ষিণামুখী জলপ্রবাহ ধারণ করে। বইনগঙ্গা, ওয়ার্ধা, পেঞ্চ, কান্হান নদী গোদাবরী নদী ব্যবস্থায় প্রচুর জলের যোগান দেয়। গোদাবরী নদী প্রধানত ইন্দ্রবতী উপত্যকায় উপ-ক্রান্তীয়, আধা-বাষ্পীয় অরণ্য সৃষ্টি করেছে। সরকার গোদাবরী রিভার বেসিন প্রজেক্টসহ নানা গুরুত্বপূর্ণ সেচ প্রকল্প হাতে নিয়েছে।

জনমিতি

জনসংখ্যা: মধ্য প্রদেশের জনসংখ্যা একাধিক জাতিগত গোষ্ঠী, উপজাতি, বর্ণ, সম্প্রদায় ও দেশজ উপজাতি ও সম্প্রতি অন্যান্য রাজ্য থেকে এ রাজ্যে আসা উপজাতীয় গোষ্ঠী নিয়ে গঠিত। তপসিলি সম্প্রদায় ও তপসিলি উপজাতি রাজ্যের জনসংখ্যার একটি বড় অংশ। মধ্য প্রদেশের প্রধান উপজাতীয় গোষ্ঠীগুলো হচ্ছে: গোণ্ড, ভিল, বাইগা, কোরকু, ভাড়িয়া হালবা, কাউল, মারিয়া, মাল্টো ও সাহারিয়া। ধর, ঝাবুয়া ও মাণ্ডলা জেলায় ৫০ শতাংশের বেশি উপজাতীয়র বাস। অন্যদিকে খরগোন, ছিন্দবড়া, সেউনি, সিধি. সিংগ্রাউলি ও শাহ্দোল জেলায় ৩০-৫০ শতাংশ উপজাতি বাস করে। ২০১১ সালের শুমারি অনুযায়ী, মধ্য প্রদেশের উপজাতিগুলির জনসংখ্যা ১কোটি ৫৩লাখ, যা মোট জনসংখ্যার ২১.১ শতাংশ। রাজ্যে ৪৬টি স্বীকৃত তপসিলি উপজাতি এবং এদের মধ্যে ৩টি আবার 'বিশেষ আদিম আদিবাসী গ্রুপ'-এর বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

ভাষা

রাজ্যের সরকারি ভাষা হিন্দি। এছাড়া পাশে মহারাষ্ট্র হওয়ায় এবং এখানে বহুদিন মারাঠি শাসন বলবৎ থাকায় বিপুলসংখ্যক মানুষ মারাঠি ভাষায় কথা বলে। এছাড়া হিন্দি উচ্চারণে মালোয়ায় মালোয়ায়ী, নিমারে, নিমাড়ি, বুন্দেলখণ্ডে বুন্দেলি, বাগেলখণ্ডে বাঘেলি এবং রাজস্থান-সংলগ্ন এলাকায় রাজস্থানী ভাষা প্রচলিত আছে। কোন কোন অঞ্চলে তেলুগু, ভিলোড়ি

গোয়ালিয়রের লোকেশ্বরীতে যুধ্যমান নীলগাই

(ভিলি), গোণ্ডি, কোরকু, কালটো (নাহালি) এবং নিহালি (নাহালি) ভাষা উপজাতীয় গোষ্ঠীগুলির মধ্যে প্রচলিত।

ধর্ম

২০১১ সালের শুমারি অনুযায়ী, মধ্য প্রদেশের ৯০.৯ শতাংশ মানুষ হিন্দুধর্মের অনুসারী। এছাড়া এখানে মুসলিম (৬.৬ শতাংশ), জৈন (০.৮ শতাংশ), খ্রিস্টান (০.৩ শতাংশ), বৌদ্ধ (০.৩ শতাংশ) ও শিখ (০.২ শতাংশ)-এর বসবাস রয়েছে।

সংস্কৃতি

মধ্য প্রদেশে ইউনেস্কো ঘোষিত ৪টি বিশ্ব ঐতিহ্য স্থান রয়েছে। এগুলি হচ্ছে খাজুরাহের দেবী জগদম্ভী মন্দিরসহ খাজুরাহো গ্রুপ মনুমেন্ট

সোন নদী

কেন নদীর উৎসমুখ

ঝাঁসি ঘাট

ওর্ছা অঞ্চলের শকুন

(১৯৮৬); সাঁচির বৌদ্ধ মনুমেন্ট (১৯৮৯) ও ভীমবেটকার পাথর-আশ্রয়। অন্যান্য স্থাপত্যগত বিশেষ মনোহর স্থানের মধ্যে রয়েছে অজয়গড়, অমরকণ্টক, আসিরগড়, বান্ধবগড়, বাওনগজ, ভুপাল, বিদিশা, চান্দেরি, চিত্রকূট, ধর, গোয়ালিয়র, ইন্দোর, নামবর, জব্বলপুর, বোরহানপুর, মহেশ্বর, মণ্ডলেশ্বর, মাণ্ডু, ওঙ্কারেশ্বর, ওর্ছা, পাঁচমারি, শিবপুরী, সোনাগিরি, মাণ্ডলা ও উজ্জয়িন।

মধ্যপ্রদেশ শাস্ত্রীয় ও লোকসংগীতের জন্য বিখ্যাত। মধ্য প্রদেশের কয়েকটি প্রসিদ্ধ সংগীত ঘরানার মধ্যে আছে মাইহার, গোয়ালিয়র ও সেনিয়া। মধ্যযুগের দুই বিখ্যাত সংগীতশিল্পী তানসেন ও বৈজু বাওরা অধুনা মধ্য প্রদেশের গোয়ালিয়রের নিকটবর্তী কোন স্থানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। প্রখ্যাত ধ্রুপদশিল্পী আমিনউদ্দিন ডগর (ইন্দোর), গুণ্ডেচা ভ্রাতৃদ্বয় (উজ্জয়িন), উদয় ভাওয়লকর (উজ্জয়িন)-এর জন্মও আজকের

হালচাষ

মধ্য প্রদেশে। চলচ্চিত্রের নেপথ্য কণ্ঠশিল্পী কিশোরকুমার (খাণ্ডোয়া) ও লতা মঙ্গেশকর (ইন্দোর) এবং সুরকার আদেশ শ্রীবাস্তব (জব্বলপুর)-এর জন্মও মধ্য প্রদেশে। স্থানীয় লোকগান রীতির মধ্যে ফাগ, ভর্তাহরি, সঞ্জাগীত, ভোপা, কালবেলিয়া, ভাট/ভাণ্ড/চরণ, ব্যাসদের, বিদেশিয়া, কালগি তুরা, নির্গুনিয়া, আলহা, পাণ্ডবনি গায়ন ও গর্বা গর্বি গোভালন উল্লেখ্যযোগ্য।

মধ্য প্রদেশের প্রধান প্রধান লোক নৃত্যশিল্পীরা হচ্ছেন রাই, কারমা, সাইলা, মাতকি, গাঙ্গুয়ার, বাধাই, বরেদি, নৌরাত, আহিরি ও ভগোরিয়া।

অর্থনীতি

২০১৩-১৪ অর্থ বছরে মধ্য প্রদেশের গড় দেশজ উৎপাদন ছিল প্রায় ৪লাখ ৫০হাজার ৯শো কোটি রুপি (৭হাজার ২শো ৭২ কোটি ৬০ লাখ ডলার)। একই সময়ে গড় মাথাপিছু আয় ৮৭১.৪৫ ডলার– যা দেশের ষষ্ঠ সর্বনিম্ন। মধ্য প্রদেশের মুরেনা জেলা মধু উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত। রাজ্যের অর্থনীতি কৃষিভিত্তিক। মধ্য প্রদেশের প্রধান প্রধান ফসল হচ্ছে গম, সয়াবিন, গ্রাম, আখ, ডাল, ভুট্টা, তৈলবীজ, সরিষা ও অড়হর। ক্ষুদ্র বনজ উৎপাদনের মধ্যে আছে বিড়ি তৈরির টেন্ডু পাতা, শাল বীজ, সেগুন বীজ ও লাক্ষা। এসব পণ্য গ্রামীণ অর্থনীতিতে কিছুটা অবদান রাখে।

মধ্য প্রদেশে ৫টি বিশেষ অর্থনৈতিক জোন রয়েছে। এগুলো হচ্ছে: ইন্দোর ও গোয়ালিয়রে ৩টি আইটি/আইটিইএস এবং জব্বলপরে ২টি খনিজ ও কৃষিভিত্তিক জোন। ইতোমধ্যে আরও ১৪টি বিশেষ অর্থনৈতিক জোনের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। এর মধ্যে ১০টি আইটিভিত্তিক। ইন্দোর রাজ্যের প্রধান বাণিজ্যিক কেন্দ্র। দেশের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত হওয়ায় মধ্য প্রদেশে অনেক ভোগ্যপণ্য কারখানা গড়ে উঠেছে। মধ্যপ্রদেশ হচ্ছে ভারতের সর্ববৃহৎ হীরা ও তামা উৎপাদনকারী রাজ্য। অন্যান্য প্রধান খনিজ মজুতের মধ্যে কয়লা, কোলবেড মিথেন, ম্যাঙ্গানিজ ও ডোলোমাইট উল্লেখযোগ্য।

মধ্য প্রদেশে ৬টি অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি রয়েছে। এর ৪টি জব্বলপুরে (ভেহিক্যাল ফ্যাক্টরি, গ্রে আয়রন ফাউন্ড্রি, গান ক্যারিজ ফ্যাক্টরি, অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি খামারিয়া) এবং ২টি কাত্নি ও ইতারসিতে অবস্থিত।

অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরিজ বোর্ড পরিচালিত এসব কারখানায় ভারতীয় সশস্ত্রবাহিনির বিভিন্ন সামরিক সরঞ্জাম উৎপাদিত হয়।

চমৎকার কাজের স্বীকৃতি হিসেবে মধ্যপ্রদেশ মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি অ্যাক্ট ২০০৫-এর ১০ম জাতীয় পুরস্কার লাভ করে।

রাজ্যের পর্যটন শিল্প দ্রুত প্রসারিত হচ্ছে। পর্যটক-আকর্ষক দ্রষ্টব্যের মধ্যে একাধিক বন্যপ্রাণি অভয়ারণ্য ছাড়াও ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় স্থান রয়েছে। সাঁচি ও খাজুরাহো বিদেশী পর্যটকদের খুব পছন্দের গন্তব্য। এছাড়া বেদঘাট, ভীমবেটকা, ভোজপুর, মহেশ্বর, মাণ্ডু, ওর্ছা, পাঁচমারি, কানহা, জব্বলপুর ও উজ্জয়িন জনপ্রিয় পর্যটক গন্তব্য।

অবকাঠামো

বিদ্যুৎ: ২০১৭ সালের ৩১ মে পর্যন্ত মধ্য প্রদেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন:

পরীক্ষাকেন্দ্রে শিশুরা

শ্রীরাম ঘাট

তাপবিদ্যুৎ– ১২হাজার ৭শো ৩১ দশমিক ৭০ মেগাওয়াট; নবায়নযোগ্য– ৩ হাজার ৫শো ৩৭ দশমিক ৮৯ মেগাওয়াট; পারমানবিক– ২শো ৭৩ দশমিক ২ মেগাওয়াট। মধ্যপ্রদেশ বিদ্যুৎ বোর্ড জব্বলপুরে অবস্থিত।

যোগাযোগ

সড়ক পরিবহন: মধ্য প্রদেশের সড়ক নেটওয়ার্ক– জাতীয় মহাসড়ক ৫হাজার ২৭ কিলোমিটার, রাজ্য মহাসড়ক ১০হাজার ৪শো ২৯ কিমি, প্রধান জেলা সড়কসমূহ ১৯ হাজার ২শো ৪১ কিমি। বাস ও ট্রেন মধ্য প্রদেশের অধিকাংশ এলাকাকে সংযুক্ত করেছে। ২০টি জাতীয় মহাসড়কসহ রাজ্যের রাস্তার দৈর্ঘ্য ৯৯হাজার ৪৩ কিমি (৬১হাজার ৫শো ৪২ মাইল)।

রেলপথ: ভারতীয় রেলপথের পশ্চিম-মধ্যাঞ্চলীয় রেলওয়ে জোনের সদরদপ্তর জব্বলপুরকে কেন্দ্র করে রেলপথের দৈর্ঘ্য ৪হাজার ৯শো ৪৮ কিলোমিটার (৩হাজার ৭৫ মাইল)। মধ্যাঞ্চল রেলওয়ে ও পশ্চিমাঞ্চল রেলওয়েও রাজ্যের কিছু অংশ জুড়ে আছে। পশ্চিম মধ্য প্রদেশের অধিকাংশ এলাকা পশ্চিমাঞ্চলীয় রেলওয়ের রডলাম রেল ডিভিশনের অন্তর্গত। এই রেলপথ ভুপালের ইন্দোর, উজ্জয়িন, মাণ্ডসুর, খাণ্ডোয়া, নীমুচ ও বৈরাগড়ের মত শহরকে সংযুক্ত করেছে। রাজ্যে মোট ২০টি রেলওয়ে জংশন রয়েছে। ভুপাল, ইন্দোর, গোয়ালিয়র ও জব্বলপুরে আন্তঃজেলা বাস টার্মিনাল রয়েছে। এসব শহরের মধ্যে দৈনিক দু'হাজারের বেশি বাস চলাচল করে থাকে। এছাড়া বেসরকারি/ব্যক্তিগত অটো ও ট্যাক্সি তো রয়েছেই। রাজ্যে কোন সমুদ্রসৈকত নেই। মধ্য প্রদেশের মধ্যে সড়ক ও রেল সংযুক্ত প্রতিবেশী রাজ্যের খাণ্ডালা ও জওহরলাল নেহরু বন্দর (নব সেবা)-এর মাধ্যমে অধিকাংশ সমুদ্রবাণিজ্য সম্পন্ন হয়।

বিমান: মধ্য প্রদেশের ব্যস্ততম বিমান বন্দর হচ্ছে ইন্দোরের দেবী অহল্যাবাঈ হোলকার বিমানবন্দর। ভুপালের রাজা ভোজ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, জব্বলপুরের ডুমনা বিমান বন্দর, গোয়ালিয়র বিমানবন্দর ও খাজুরাহো বিমানবন্দরেও বাণিজ্যিক বিমান চলাচল করে। এছাড়াও সাগর, রডলাম, মাণ্ডসুর, উজ্জয়িন, খাণ্ডোয়া, রেওয়া, শিবপুরী ও সাত্‌নায় ছোট এয়ারট্রিপের ব্যবস্থা আছে।

সরকার ও রাজনীতি

মধ্যপ্রদেশ বিধানসভার আসন সংখ্যা ২৩০। ভারতীয় জাতীয় সংসদে আসন সংখ্যা ৪০ (এর মধ্যে ২৯টি লোকসভা ও ১১টি রাজ্যসভা)। রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান হচ্ছেন গভর্নর, ভারতের রাষ্ট্রপতি তাঁকে মনোনয়ন দেন। নির্বাহী ক্ষমতা মুখ্যমন্ত্রীর হাতে। ২০১৬ সালে বর্তমান গভর্নর ওমপ্রকাশ কোহলি (অতিরিক্ত দায়িত্ব) ও মুখ্যমন্ত্রী ভারতীয় জনতা পার্টি(বিজেপি)-র শিবরাজ সিং চৌহান। ২০১৩ সালের নির্বাচনে বিজেপি ১৬৫ এবং কংগ্রেস ৫৮টি আসন লাভ করে। অন্যদিকে তৃতীয় বৃহত্তম দল বহুজন সমাজ পার্টি লাভ করে ৪টি আসন।

প্রশাসন: মধ্য প্রদেশে ১০টি বিভাগে মোট ৫১টি জেলা রয়েছে। ২০১৩ সালের শুমারি অনুযায়ী, রাজ্যে ৫১টি জেলা পঞ্চায়েত, ৩৬৭টি তহসিল, ৩১৩টি জনপদ পঞ্চায়েত/ব্লক এবং ২৩ হাজার ৪৩টি গ্রাম রয়েছে। এছাড়া ১৬টি নগর নিগম, ১০০টি নগর পালিকা এবং ২৬৪টি নগর পঞ্চায়েত রয়েছে।

ওর্ছার লেঙ্গুর

শিক্ষা

২০১১ সালের শুমারি অনুযায়ী, রাজ্যে সাক্ষরতার হার ৭২.৬ শতাংশ। এ সময়কালে রাজ্যে ১লাখ ৫হাজার ৫৯২টি প্রাথমিক, ৬হাজার ৩৫২টি উচ্চ বিদ্যালয় এবং ৫হাজার ১৬১টি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে। রাজ্যে ২০৮টি প্রকৌশল ও স্থাপত্য কলেজ, ২০৮টি ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউট এবং ১২টি মেডিক্যাল কলেজ রয়েছে।

নেতৃস্থানীয় উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে আছে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স এডুকেশন এন্ড রিসার্চ ভুপাল, আইআইএম ইন্দোর, আইআইটি ইন্দোর, এনআইটিটিটিআর (ভুপাল), মৌলানা আজাদ ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (ভুপাল), আইআইআইটিডিএম

হোসেংবাদে বালির ভাস্কর্য

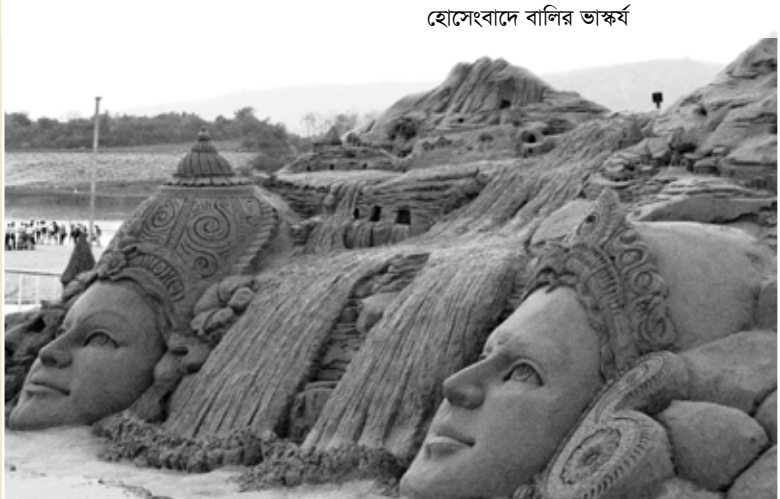

বাইগা যুবতীরা

রাইসেন জেলায় গম কাটছে চাষিবৌ

মধ্য প্রদেশের রাজ্য পাখি দুধরাজ

জব্বলপুর, আইআইআইটিএম গোয়ালিয়র, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ট্যুরিজম এন্ড ট্রাভেল ম্যানেজমেন্ট (আইআইটিটিএম, গোয়ালিয়র), এসপিএ ভুপাল, আইআইএফএম ভুপাল, ন্যাশনাল ল' ইনস্টিটিউট ইউনিভার্সিটি (ভুপাল), ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড সায়েন্স, আইপিএস একাডেমি ইন্দোর, অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস ভুপাল এবং জব্বলপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। রাজ্যে একটি ভেটেরিনারি সায়েন্স ইউনিভার্সিটি (নানাজি দেশমুখ ভেটেরিনারি সায়েন্স ইউনিভার্সিটি) রয়েছে। এর অধীনে জব্বলপুর, মোহ্ ও রেওয়ায় তিনটি কলেজ রয়েছে। জাতীয় মহাসড়ক ৩-এর ওপর গুনায় জয়পি ইউনিভার্সিটি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজির একটা খুব সুন্দর ক্যাম্পাস তৈরি হয়েছে। মধ্য প্রদেশের প্রথম বেসরকারি এই বিশ্ববিদ্যালয়টির পড়ালেখার মান খুবই ভাল। জুয়েট এনআইআরএফ-এর সেরা ১০০টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৮৬তম স্থান অধিকার করেছে।

রাজ্যের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ৫০০টি ডিগ্রি কলেজ রয়েছে। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে জওহরলাল নেহরু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, মধ্যপ্রদেশ ভেটেরিনারি সায়েন্স ইউনিভার্সিটি, মধ্যপ্রদেশ মেডিক্যাল সায়েন্স ইউনিভার্সিটি, রাজীব গান্ধী টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি (ভুপাল), অবধেশ প্রতাপ সিং ইউনিভার্সিটি (রেওয়া), বরকতুল্লাহ ইউনিভার্সিটি (ভুপাল বিশ্ববিদ্যালয়), দেবী অহল্যা বিশ্ববিদ্যালয় (ইন্দোর), রানি দুর্গাবতী ইউনিভার্সিটি (জব্বলপুর), বিক্রম ইউনিভার্সিটি (উজ্জয়িন), জীবাজি ইউনিভার্সিটি (গোয়ালিয়র), ড. হরি সিং গৌর ইউনিভার্সিটি (সাগর ইউনিভার্সিটি), ইন্দিরা গান্ধী ন্যাশনাল ট্রাইবাল ইউনিভার্সিটি (অমরকণ্টক, অনুপপুর) এবং মাখনলাল চতুর্বেদী ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ জার্নালিজম এন্ড কমিউনিকেশন (ভুপাল) উল্লেখ্যযোগ্য।

১৯৭০ সালে চিকিৎসা বিজ্ঞানে পড়ার জন্য প্রি-মেডিক্যাল টেস্ট বোর্ড গঠিত হয়। ১৯৮১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় প্রি-ইঞ্জিনিয়ারিং বোর্ড। পরে ১৯৮২ সালে দুটি প্রতিষ্ঠান একীভূত করে মধ্যপ্রদেশ প্রফেশনাল এক্সামিনেশন বোর্ড গঠিত হয়।

উৎসব ও মেলা

মধ্য প্রদেশের প্রতিটি এলাকার প্রথা ও বিশ্বাস উৎসব ও মেলায় বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেছে। খাজুরাহো, ভোজপুর, পাঁচমারি ও উজ্জয়িনের শিবরাত্রি, জব্বলপুরের দশেরা, চিত্রকূট ও ওর্ছার রাম-নবমী, ঝাবুয়ার ভাগোরিয়া নাচ এবং খাজুরাহের বার্ষিক নৃত্যোৎসব পর্যটকদের মনে দাগ কাটতে বাধ্য। ইন্দোর, মাণ্ডু ও উজ্জয়িনের মালোয়া উৎসব ও পাঁচমারি উৎসব রাজ্যের লোক ও উপজাতি সংস্কৃতিকে জীবন্ত করে তোলে। গোয়ালিয়র বাণিজ্য মেলা ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম বাণিজ্য মেলা। ইলেকট্রনিক, অটোমোবাইল, খাদ্যপণ্য প্রভৃতি নানা বিভাগে বিভক্ত থাকে এ মেলা। ২০১২ সাল থেকে শুরু হয়েছে গোয়ালিয়র কার্নিভাল। এটি প্রতিবছর ২২ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয়। কার্তিক পূর্ণিমায় পবিত্র শহর মহেশ্বরে প্রতিবছর নিমার উৎসব পালিত হয়ে থাকে। তিনদিনের এ উৎসবে অহল্যাঘাটে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

সংবাদ মাধ্যম

দৈনিক ভাস্কর, *দৈনিক জাগরণ*, *রাষ্ট্রীয় হিন্দি মেইল*, *নব ভারত*, *নঈ দুনিয়া*, *রাজস্থান পত্রিকা*, *রাজ এক্সপ্রেস* প্রভৃতি মধ্য প্রদেশের নেতৃস্থানীয় হিন্দি সংবাদপত্র। বিভিন্ন শহর থেকে নানা স্থানীয় সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়ে থাকে। ইংরেজি দৈনিকের মধ্যে *টাইমস অফ ইন্ডিয়া*, *হিন্দুস্থান টাইমস*, *দি হিতবাদ*, *সেন্ট্রাল ক্রনিকল* এবং *ফ্রি প্রেসের* ভুপাল সংস্করণ বের হয়।

ক্রীড়া

২০১৩ সালে রাজ্য সরকার মল্লকম্বকে রাজ্য ক্রীড়া হিসেবে ঘোষণা করে। ক্রিকেট, কাবাডি, হকি, ফুটবল, ভলিবল, সাইক্লিং, সাঁতার, ব্যাডমিন্টন, টেবিল টেনিস জনপ্রিয় খেলা। ঐতিহ্যবাহী খেলার মধ্যে খোখো, গিল্লি ডাণ্ডা, সিতোলিয়া, কাঁচে ও ল্যাংড়ি গ্রামীণ এলাকায় খুব জনপ্রিয়।

জব্বলপুরের ব্রিটিশ সেনাবাহিনির অফিসাররা স্কুকার আবিষ্কার করেছিলেন বলে ধরা হয়। এটি অনেক ইংরেজিভাষী কমনওয়েলথভুক্ত দেশে জনপ্রিয়।

ক্রিকেট মধ্য প্রদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা। এখানে ৩টি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম রয়েছে। এগুলো হচ্ছে: ইন্দোরের নেহরু স্টেডিয়াম, গোয়ালিয়রের রূপ সিং স্টেডিয়াম এবং ইন্দোরের হোলকার ক্রিকেট স্টেডিয়াম।

সূত্র মধ্যপ্রদেশ সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংকলিত
অনুবাদ মানসী চৌধুরী

চম্বলে ভেড়ার পাল নিয়ে রাখাল

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

এমিলি জামান

বহুমাত্রিক ও সূক্ষ্মদর্শী কথাসাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পর্কে *দেশ* পত্রিকার ১৯৮৩ সালের সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যায় অজিতকুমার সেনগুপ্ত লিখেছিলেন, '১৯৬৩-র চব্বিশে আগস্ট সংখ্যা থেকে অবিস্মরণীয় ধারাবাহিক 'সুনন্দর জার্নাল' শুরু হয়ে রুচিবান বাঙালি পাঠককে মাতিয়ে দেয়।

সুনন্দ (নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়) অর্জন করেন দুর্দান্ত খ্যাতি, ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর অকালমৃত্যুর দিন পর্যন্ত প্রতি সপ্তাহে চিত্রশিল্পী চণ্ডী লাহিড়ীর অনুপম কার্টুনের সঙ্গে *দেশ*-এর পাতায় 'সুনন্দর জার্নাল' প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর মৃত্যুর পর শোক-বিহ্বল পাঠকেরা *দেশ* সম্পাদকের কাছে যে-সব চিঠি পাঠান, তার প্রত্যেকটিতে প্রিয় সাহিত্যিকের তিরোধানে অন্তরের শোক ব্যক্ত করার পাশাপাশি তীব্র হাহাকারও ধ্বনিত হয় যে, 'সুনন্দর জার্নাল' আর পড়া হবে না। 'সুনন্দ' নামের পেছনে কে আত্মগোপন করে আছেন তা জানতে শুরু থেকেই পাঠকসাধারণ আগ্রহী হয়ে নানাভাবে তল্লাশি চালান কিন্তু পাঠকসাধারণ তো দূরের কথা, *দেশ*-দফতরের কোন কর্মীও তথ্যটি জানতেন না। জানতেন শুধু *দেশ*-সম্পাদক, লেখক নিজে এবং তাঁর এক ঘনিষ্ঠজন। *পঞ্চতন্ত্র*খ্যাত বরেণ্য সাহিত্য-ব্যক্তিত্ব সৈয়দ মুজতবা আলীকে উৎসর্গ করা, গ্রন্থরূপে প্রকাশিত 'সুনন্দর জার্নাল'-এর প্রথম খণ্ডের ভূমিকাও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 'সুনন্দ' নামেই লিখেছিলেন। নাম-সম্পর্কে কঠোর গোপনীয়তা রক্ষার পেছনে তেমন মারাত্মক কোন কারণ ছিল না। তিক্ত-সত্য হুল-ফোটানো ভাষায় তুলে ধরার জন্য বক্তা ছদ্মবেশ ধারণ করেন। তবে, বহুমাত্রিক নারায়ণ কেবলমাত্র মজাদার রম্যরচনা (যা ছিল কৌতুক-রসে জারিত সোশ্যাল স্যাটায়ার) আর কিশোর-সাহিত্যের অঙ্গনে থেমে থাকেননি।

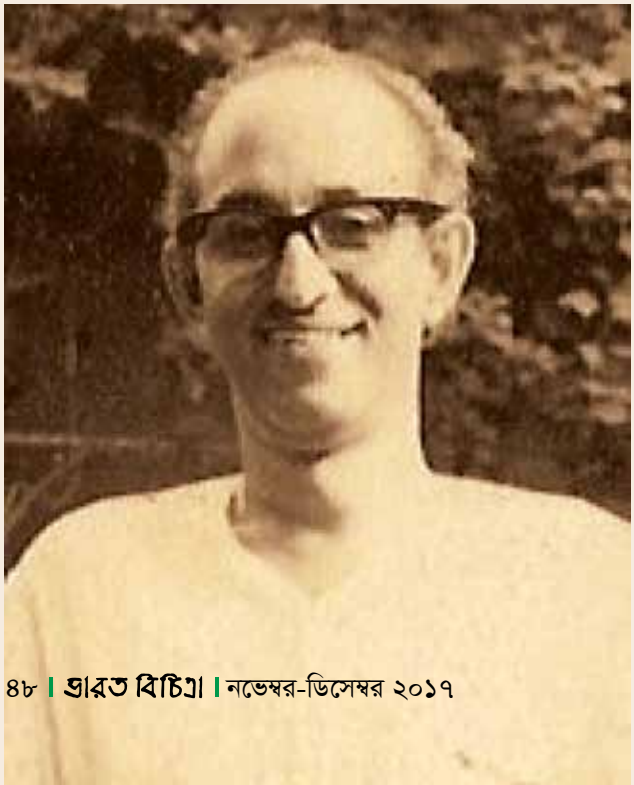

'সুনন্দর জার্নাল' আর 'টেনিদা'র গণ্ডি পেরিয়ে শ্রী গঙ্গোপাধ্যায়ের সুবর্ণ অভিষেক ঘটেছে সাহিত্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শাখা ছোটগল্পে। '... আজ বোধহয় তিনি বোগদাদের (বাগদাদের) বাদশা হারুন-আল-রশীদের (হারুন-অর-রশীদ) মত ছদ্মবেশে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। তাই জোহরার প্রার্থনা তিনি শুনতে পেলেন।'

উদ্ধৃত দর্শন-দীপ্ত বাক্যনিচয় নারায়ণের 'ইদু মিঞার মোরগ' ছোটগল্পের অংশবিশেষ। এই 'তিনি' কারো ভগবান, কারো আল্লাহ্ আর কারো গড (God)। 'জোহরা' নির্যাতিত মানবাত্মার নিরুপায় ক্রন্দন, যে ক্রন্দনে বিচলিত হয়ে 'তিনি' মাঝে মাঝে দেখা দেন। কবিগুরুর ভাষায় বলতে হয় 'মাঝে মাঝে তব দেখা পাই'। দেখা পাওয়ার এই বিষয়টি শ্রী গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পে যৌক্তিক কাহিনি-বিন্যাস ও ভাষার স্বচ্ছতায় এতটাই প্রাণ পেয়েছে যে সংবেদনশীল পাঠকের চোখের কোণ আর্দ্র হয়ে ওঠে। বৈষয়িক মানদণ্ডের নিরিখে দরিদ্র, কিন্তু মানবিকতার বিচারে ঐশ্বর্যশালী ইদু মিঞার পোষ্য মোরগটির মাধ্যমে নারায়ণ কেবলমাত্র আকৃতি-সর্বস্ব মানব-সমাজের স্থূল-মানসিকতাই চিত্রিত করেননি, জীবের অন্তরের কান্নাও শুনিয়েছেন। গল্পের প্লট নির্মাণে তিনি দুর্ধর্ষ নিপুণতা দেখিয়েছেন। গল্পের এগিয়ে চলার ধারাবাহিকতায় বড়রা ক্রমাগত ছোটদেরকে গলাধঃকরণ করেছে। দীন মহম্মদ দারোগা দবিরুদ্দিন দফাদারকে এবং ইনসপেক্টর ইমতিয়াজ চৌধুরী দারোগা দীন মহম্মদকে কাবু করেছে। কিন্তু গল্পের ইতিধর্মিতায় সবার চেয়ে যে ছোট অর্থাৎ অবলা প্রাণী ইদু মিঞার মোরগটি অপরাজিতই থেকে গেছে। তাকে কেউই গলাধঃকরণ করতে পারেনি। নারায়ণের মৌলিকতা গল্পের শেষাংশে স্পষ্ট প্রতিবিম্বিত হয়েছে। পাঠকের অশ্রুসজল নেত্রে আচমকাই আনন্দের দ্যুতি ছড়িয়ে দিয়েছেন গল্পকার।

নারায়ণের আরো একটি জীবনঘনিষ্ঠ ছোটগল্প 'বাইশে শ্রাবণ' স্মৃতিদ্বারে কড়া নাড়ছে। 'বাইশে শ্রাবণ' একটি কলেজের রবীন্দ্রজয়ন্তীকে কেন্দ্র করে রচিত প্রাণস্পর্শী ছোটগল্প। গল্পের চরিত্র শকুন্তলা তার দারিদ্র্যক্লিষ্ট বোঝা হয়ে ওঠা জীবনের কান্না বিশ্বকবিকে নিবেদন করেছে একটি সান্ত্বনাসিক্ত উত্তরের প্রত্যাশায়।

> 'বেদীর ওপর রবীন্দ্রনাথের মালা-চন্দন-ভূষিত চিত্রমূর্তি। একটা ধুপকাঠির শেষ প্রান্তটুকু তখনো জ্বলছে, একটা প্রদীপের বুক জ্বলছে তখনো। কান্নার বেগে থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে শকুন্তলা ছবির সামনে লুটিয়ে পড়ল।
> – তুমি দেবতা, তুমি মহাকবি। মানুষের প্রেমে তোমার চোখের জল ঢেলে পৃথিবীকে তুমি ধন্য করে গেছ। তুমিই বল আমার কতখানি অপরাধ? বাবা-দাদা-অজিত-আমি আজ তোমার মৃত্যু তিথিতেও কেন এমন করে পাপের অন্ধকারে তলিয়ে চলেছি– তুমিই তার জবাব দাও।'

শকুন্তলার আর্তি বিশ্বকবির চরণে ঝরে পড়েছে এই ছোট একটি জিজ্ঞাসায়। রসজ্ঞ পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগে– একি আত্মপ্রকাশ, নাকি বিশ্বকবির চরণ ধরে বিশ্বস্রষ্টার কাছে আত্মসমর্পণ?

মনে পড়ছে স্নায়ুতন্ত্রীতে আঘাত হানা নারায়ণের আরেকটি ঋদ্ধ ছোটগল্প 'রেকর্ড'। সত্য যেন টুকরো-টুকরো প্রতিবিম্ব হয়ে জগতজুড়ে ছড়িয়ে থাকে। গল্পে যুদ্ধের গানের প্রতীকে নারায়ণ অতি সূক্ষ্ম এই জাগতিক দর্শন অনন্য শৈল্পিক দক্ষতায় চিহ্নিত করেছেন। খাসিয়াদের নাচ, ক্রুদ্ধ বাঘের গর্জন, মাসাইদের বাদ্যযন্ত্রের জোরালো আওয়াজ... সর্বত্র ধ্বনিত সুতীব্র উল্লাস আর যন্ত্রণার আর্তনাদ। যেন জীবন-বাস্তবের দুই বিপরীত তল। যুদ্ধাহত আর্ত মানবাত্মার সুতীব্র চিৎকার বিন্দু থেকে বৃত্তে ঘূর্ণায়মান। এই চিৎকার দমিয়ে রাখার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও হেরে গেছে স্বৈরাচারী দাম্ভিকের কৌশলী ষড়যন্ত্র। চোরাবাজারের ভাঙাচোরা রেকর্ডের ভিড়ে খুঁজে পাওয়া গেছে বহুযুগ আগে নিষিদ্ধঘোষিত যুদ্ধের গানের বিশেষ একটি রেকর্ড। পাঠকের রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষার পর গল্পের শেষে রেকর্ডটিকে সনাক্ত করলেন এক পর্যটক। হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে আশাবাদী নারায়ণ আবারো ভরিয়ে দিলেন ভাবিত পাঠকের অন্তর-মহল।

তথ্যসূত্র

০১. *সুনন্দর জার্নাল* অখণ্ড সংস্করণ (মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি. কলকাতা)
০২. ভারতীয় সাপ্তাহিক পত্রিকা *দেশ*

এমিলি জামান শিক্ষক, সংস্কৃতিকর্মী

বামে: ৭ অক্টোবর ২০১৭ ঢাকার শাহবাগে জাতীয় জাদুঘরের কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র আয়োজিত সংগীতসন্ধ্যায় সুজিত মোস্তফার একক সংগীত পরিবেশন

নীচে: ১৪ অক্টোবর ২০১৭ সন্ধ্যায় ঢাকার শাহবাগে জাতীয় জাদুঘরের কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র আয়োজিত সংগীতসন্ধ্যায় ভারতের স্বপন দত্ত বাউল বাংলাদেশের দীপঙ্কর মণ্ডলের সংগীত পরিবেশন

বামে উপরে: ২০ অক্টোবর ২০১৭ সন্ধ্যায় ঢাকার ছায়ানট মিলনায়তনে ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র আয়োজিত 'পঞ্চকবির গান' শীর্ষক সংগীতসন্ধ্যায় কলকাতার ঋদ্ধি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংগীত পরিবেশন। অনুষ্ঠানে অতুলপ্রসাদের ওপর তাঁর সর্বশেষ অ্যালবাম প্রকাশ করা হয়

বামে নীচে: ২১ অক্টোবর ২০১৭ সন্ধ্যায় ঢাকার শাহবাগে জাতীয় জাদুঘরের কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে শ্রীমতী বুলবুল মহলানবিশের একক সংগীত পরিবেশন

নীচে: ৩১ অক্টোবর ২০১৭ সন্ধ্যায় ঢাকার শাহবাগে জাতীয় জাদুঘরের কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে কিংবদন্তী সংগীতশিল্পী আব্বাসউদ্দিনের ১১৬তম জন্মদিনে ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র আয়োজিত সংগীতসন্ধ্যায় তাঁর পুত্র মোস্তফা জামান আব্বাসী ও দৌহিত্রী ড. নাশিদ কামালের সংগীত পরিবেশন

Regd. No. DA 355 Bharat Bichitra November-December 2017

ঢাকার ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র

ভারতীয় হাই কমিশনের সর্বশেষ তথ্য জানতে আমাদের ওয়েবসাইট, ফেসবুক, টুইটার ও ইউটিউব নিয়মিত ভিজিট করুন, লাইক দিন ও টুইট ফলো করুন:

www.hcidhaka.gov.in

/IndiaInBangladesh

@ihcdhaka

/HCIDhaka